৩১ অক্টোবর ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

খেলাধুলো

□ স্টেফির সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ
□ টেনিস, ক্রিকেট ও এশিয়াডের অজস্র রঙিন ছবি
□ ভারতের বোলিং-শক্তি কি শেষ হয়ে গেছে

■ জর্জ এভারেস্টের দু'শো বছর
■ সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান-উপন্যাস
■ রতন ভট্টাচার্যের গল্প

মাদাম তুসোর

মোমের মানুষ

নেপোলিয়ন, লিঙ্কন, চার্চিল ও পিকাসোর মতো বিখ্যাত মানুষরা কোন জাদুঘরে এখনও জীবন্ত হয়ে আছেন ?

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

রিল্যাক্সনের খুশি
আনন্দ রাশি রাশি
সারারাত রিল্যাক্সনের বিছানায় চমৎকার ঘুম।
তারফলে সারাদিন চনমনে, তাজা, হুটোপাটি আর হরেক মজা।
রিল্যাক্সনের এইতো জাদু। রিল্যাক্সন রাবারাইজ্ড কয়ার ম্যাট্রেস
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শরীরের ভার বহন করে।
এতে শুধু ঘুমই নয়, হয় সত্যিকারের বিশ্রাম।
রিল্যাক্সনের ছোঁয়ায় খুশিতে ভরে উঠুক সারাদিন।
Sobhagya/RIL—3/90/BEN
RILAXON
আপনার আরামের জন্য
গদী • তাকিয়া • বালিশ
শ্রী দিগবিজয় সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের
'কয়ার ও ফেল্ট' ডিভিশন
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড কলকাতা-৭০০ ০০১
ISI 8291-1977

১৩ কার্তিক ১৩৯৭ □ ৩১ অক্টোবর ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ১৪ সংখ্যা

খেলাধুলো

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ) ■
চাঁদের মাঠে ওয়ান ডে সিদ্ধার্থ ঘোষ ৫৮
■ গল্প ■
বিলুপ্ত প্রজাতি রতন ভট্টাচার্য ২৬
অপরাজিতা দীপা তালুকদার ৩৬
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
কালাপাহাড় সমরেশ মজুমদার ২৩
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
মাদাম তুসোর মোমের মানুষ গৌতম চক্রবর্তী ১২
■ দীর্ঘ কবিতা ■
মেঘবালিকার জন্য রূপকথা জয় গোস্বামী ৬
■ বিশ্ববিচিত্রা ■
জর্জ এভারেস্ট অশোক সেনগুপ্ত ৮
■ কমিক্স ■
টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৪৯, গাবলু ৫৪, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
■ টাকাকড়ি ■
মৌর্যোত্তর যুগ : দক্ষিণ ভারতের···ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৫
■ কেরিয়ার গাইড ■
জি· বি· পন্থ ইউনিভার্সিটি···অমর দাশ ৫৬
■ প্রকৃতিবিজ্ঞান ■
জীবনদায়ী গাছের সন্ধানে নীরদ রায় ৩২
■ খেলাধুলো ■
কবাডিতে এই কি প্রথম···আশিস উপাধ্যায় ৪০
মেয়েদের ভারোত্তোলনে সোনা ও রুপোয়···প্রদীপ পল ৪২
ভারতের বোলিং-শক্তি···নির্মল ঘোষ ৪৪
এক নম্বরে মার্ক টেলর তমাল রায় ৪৬
মাঠ ছাড়ছেন না সুব্রত সমীরণ সেন ৪৭
খেলার খবর ৪৮
কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে স্টেফি প্রবীর বসু ৫২
■ নিয়মিত বিভাগ ■
চিঠিচাপাটি ৫, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫১, ক্যাম্পাস ৫৫, আকাশে ওড়ার কথা ৬৪, শব্দসন্ধান ৭০, আঁকিবুকি ৭৬, হাসিখুশি ৭৬, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার।
দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

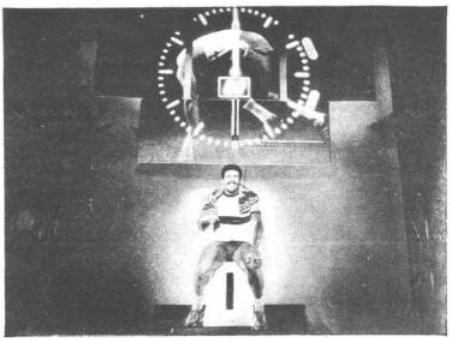

১২ লণ্ডনের অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে আছে মাদাম তুসোর জাদুঘর। বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তি মোম দিয়ে তৈরি করে এই জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন রক্তমাংসের মানুষ। নেপোলিয়ন, লিঙ্কন, চার্চিল, পিকাসো থেকে শুরু করে কার মূর্তি নেই এখানে ? টেনিসের কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, ক্রিকেটের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব ভিভ রিচার্ডস—এঁদেরও মোমের মূর্তি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে মাদাম তুসোর সংগ্রহালয়ে। আছে মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর মূর্তি। জন লেনন, মাইকেল জ্যাকসন, মেরিলিন মনরো—এঁদের সবাইকে দেখা যায় এখানে।

৪২ এশিয়াডে মেয়েদের ভারোত্তোলনে ভারত সোনা না জিতলেও কয়েকটি পদক পেয়েছে। ভারতীয় মেয়েরা এর জন্য নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। জ্যোৎস্না দত্ত, ছায়া আদক, কুঞ্জরানি দেবীর এই কৃতিত্ব আমাদের গর্বিত করেছে। কিন্তু চিনা মেয়েরা তাঁদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। সোনা ও রুপোর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান তাঁরা গড়ে তুলেছেন। এ-বিষয়ে বেজিং থেকে পাঠানো একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হল।

৮ জর্জ এভারেস্টের জন্মের দু'শো বছর পূর্ণ হল। বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম রাখা হয়েছে ভারতের প্রাক্তন এই সার্ভেয়ার জেনারেলের নামে। কিন্তু কী করে সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সে-বিষয়ে কী ভূমিকা ছিল রাধানাথ শিকদারের, তা অনেকেরই জানা নেই।

■ আগামী সংখ্যায় ■

অভীক মজুমদারের
প্রচ্ছদকাহিনী
নস্ট্রাডামুসের অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী

লীলা মজুমদারের
সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)
খোঁজা

বিকাশ চক্রবর্তীর নিবন্ধ
জন লেননের পঞ্চাশ বছর

যখন দাঁত তোলার পর খেতে পারেন না শক্ত খাবার...

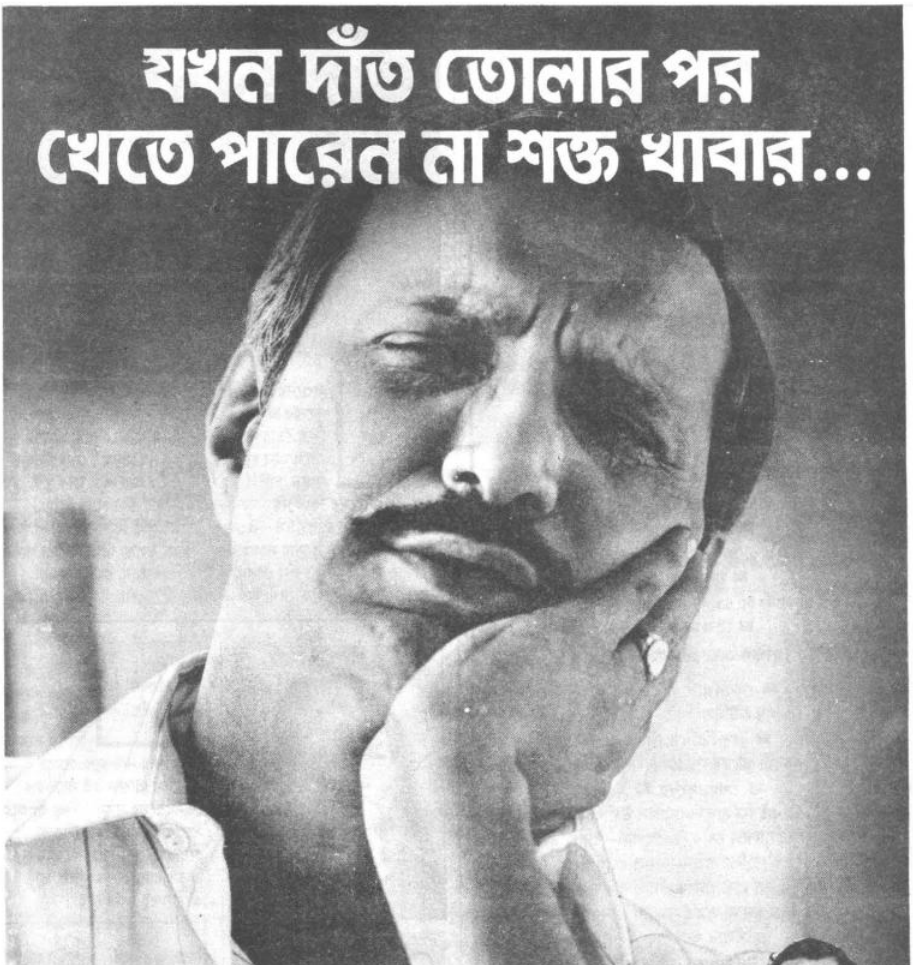

...তখন নিন এই সম্পূর্ণ আহার

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায় ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই

হ্যাঁ, অবশ্যই খান কমপ্লান। এক সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার, যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুপরিকল্পিত মাত্রায় রয়েছে শরীরের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩টি খাদ্যগুণ।

কমপ্লান

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GL-20/234/BEN

চিঠিচাপাটি

এবারের সেরা পূজাবার্ষিকী 'আনন্দমেলা'

হাতে পাওয়া মাত্র এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম ১৩৯৭ সালের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা। অসাধারণ এক সংখ্যা। নিল ও'ব্রায়েনের কুইজ থেকে জানা গেল অজানা অনেক প্রশ্নের উত্তর। উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগল 'স্বর্ণপর্ণী'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসটিও রীতিমত সুখপাঠ্য, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'ও দ্রুতলয়ের এক রোমাঞ্চকর উপন্যাস। আর 'কুয়াশা' উপন্যাসেও খুঁজে পেয়েছি নতুন এক বিষয়ের সন্ধান। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিমল কর ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে অজস্র ধন্যবাদ দুটি অনিন্দ্যসুন্দর উপন্যাস উপহার দেওয়ার জন্য। শৈলেন ঘোষের

'সোনাঝরা গল্পের ইনকা' তো চিরপরিচিত এক মরমী লেখকের কাছ থেকে পাওয়া পুজোর উপহার, যার জন্য অপেক্ষা করে থাকা যায় সারা বছর। আর, 'ফেরারি' ? আবার খুঁজে পেলাম 'জীবন অনন্ত' বা 'নারান'-এর স্রষ্টা মতি নন্দীকে।

লেখকদের ধন্যবাদ জানানোর পরেও বাকি থেকে গেল আরও অনেক প্রাপ্তিস্বীকার। বিমল দাস, দেবাশিস দেব, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়,

কৃষ্ণেন্দু চাকী, সুব্রত চৌধুরী ও অনুপ রায়কে ধন্যবাদ এতগুলি সুন্দর ছবি উপহার দেওয়ার জন্য। আর সত্যজিৎ রায় নিজে আনন্দমেলার পাঠকদের এবার এতগুলি সুন্দর ছবি উপহার দিয়েছেন... না, এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য ! সত্যিই মনের মতো অসাধারণ এক পূজাবার্ষিকী ১৩৯৭ সালের আনন্দমেলা।

দীপ্তেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৩৭

বিজ্ঞাপন দেখতে-দেখতেই আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই অধীর আগ্রহ যখন প্রায় তুঙ্গে পৌঁছেছে, তখনই হাতে এল এবারের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা। দুর্দান্ত হয়েছে এবারের প্রোফেসর শঙ্কু। প্রৌঢ় শঙ্কু নয়, একেবারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের তরুণ প্রোফেসর শঙ্কু ! মন কেড়ে নিয়েছেন পার্থসারথি চক্রবর্তী তাঁর 'সিনেমায় স্পেশাল এফেক্টস' নিবন্ধের জন্য। মহালয়ার আগেই শেষ করে দিয়েছি 'চক্রপুরের চক্করে', 'উল্কা-রহস্য' আর 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। না, সে ঘোর এখনও কাটেনি। অপেক্ষা করছি আগামী বছরের জন্য। কিন্তু সে তো অনেক... অনেকদিন বাকি !

অমিতকুমার গুপ্ত
রায়পাড়া, গরিফা

শুধু অসাধারণ বললে কিছু বোঝানো যাবে না, চমকপ্রদ বললেও মনে হয় বাকি রয়ে গেল অনেককিছু। বৈচিত্র্যে সত্যিই শ্রেষ্ঠ এবারের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা।

'উল্কা-রহস্য', 'চক্রপুরের চক্করে' না 'পাণ্ডব গোয়েন্দা', কাকে ছেড়ে কার কথা আগে বলব ? সব ক'টাই তো অসাধারণ ! 'মাধ্যাকর্ষণের রহস্য সন্ধানে' যেমন ভাল লেগেছে, তেমনই আগ্রহ নিয়ে এক নিশ্বাসে শেষ করেছি দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'হারাধন'। দারুণ লেগেছে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের গল্প 'প্রবাল দ্বীপের রহস্য'। এ ছাড়াও আলাদাভাবে উল্লেখ করতে চাই আশাপূর্ণা দেবী ও হিমানীশ

উষার রঙিন পোস্টারটা তো দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে বেশ লোভ হচ্ছে। ধাঁধা, শব্দসন্ধান, কুইজ সেগুলো তো আর নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে, অভিযোগ একটাই। এত সুন্দর চিত্রকাহিনীগুলি রঙিন হল না কেন ? তা হলে পুজোর ছুটিটা সত্যিই রঙে-রঙে ভরে উঠত।

রবীন্দ্র আগরওয়াল
বাঁকুড়া জিলা স্কুল, বাঁকুড়া

'আনন্দমেলা'র পুজোসংখ্যা সত্যিই মনটাকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। দারুণ লেগেছে 'হারাধন' আর 'বাজা তোরা রাজা যায়'।

গোস্বামীর নাম। অন্য কোনও কারণে নয়, শুধু ভাল লাগার জন্য। মনে হল, আনন্দমেলা পড়েই পুজোর ছুটিটা কাটিয়ে আসা গেল হাল অ্যান্ডারসনের দেশে। পি টি উপন্যাস ? 'উল্কা-রহস্য', 'চক্রপুরের চক্করে', 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' বা 'ফেরারি', সবক'টাই তো দারুণ ! আমি কিন্তু এখন থেকেই আশায় দিন গুনছি। আশা একটাই, আগামীবারেও হাতে আসবে এরকম ঝলমলে, দুর্দান্ত এক রঙিন পূজাবার্ষিকী।

রাকেশ গিনোরিয়া
অরুণকুমার কেশরী
সহিষিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বীরভূম

জাটিঙ্গা থেকে গোপালপুর ! আর তারপরই যেন বনবন নাগরদোলায় চেপে হঠাৎ পৌঁছে গেলাম চক্রপুরের ব্রহ্মদৈত্যের হাতে। সত্যি-সত্যিই অসাধারণ এবারের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা। নাৎসিদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রিয় বিজ্ঞানী শঙ্কু রেখেছেন তাঁর দুর্ধর্ষ ক্ষমতার পরিচয়। তিলকাঁটা বনে কুয়াশার খোঁজ করার সময় বাড়িতে বসেই তো আমার গা রীতিমত ছমছম করছিল। সত্যি, এসব দারুণ অভিজ্ঞতা কীভাবে পেতাম, যদি না হাতে আসত এবারের 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা' ? চমৎকার হয়েছে 'সোনাঝরা গল্পের ইনকা'। প্রতিটি লাইনেই যেন খুঁজে পাওয়া যায় 'মিতুল নামে পুতুলটি' আর 'খুদে যাযাবর ইসতাসি'র লেখকের সেই অসাধারণ জাদুস্পর্শ। ছড়া-কবিতাগুলোও চমৎকার। কাকে বাদ দেব, কার নাম করব বুঝতে পারছি না। প্রবন্ধগুলি প্রত্যেকটিই অসাধারণ, তবু এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ছে দুটি নাম। সুজন দাশগুপ্ত ও অনীশ দেব।

ঋতুপর্ণা রায় সল্টলেক, কলকাতা

দীর্ঘ কবিতা

মেঘবালিকার জন্য রূপকথা

জয় গোস্বামী

আমি যখন ছোট ছিলাম
খেলতে যেতাম মেঘের দলে
একদিন এক মেঘবালিকা
প্রশ্ন করল কৌতূহলে

"এই ছেলেটা
নাম কী রে তোর ?"
আমি বললাম,
"ফুসমন্তর !"

মেঘবালিকা রেগেই আগুন,
"মিথ্যে কথা। নাম কি অমন
হয় কখনো ?"
আমি বললাম,
"নিশ্চয়ই হয়। আগে আমার
গল্প শোনো।"

সে বলল, "শুনব না, যা—
সেই তো রানি, সেই তো রাজা
সেই তো একই ঢালতলোয়ার
সেই তো একই রাজার কুমার
পক্ষিরাজে—
শুনব না আর।
ওসব বাজে।"

আমি বললাম, "তোমার জন্যে
নতুন ক'রে লিখব তবে।"

সে বলল, "সত্যি লিখবি ?
বেশ তা হলে
মন্ত্র করে লিখতে হবে।
মনে থাকবে ?
লিখেই কিন্তু আমায় দিবি।"

আমি বললাম, "তোমার জন্যে
লিখতে পারি এক পৃথিবী।"

লিখতে লিখতে লেখা যখন
সবে মাত্র দু-চার পাতা
হঠাৎ তখন ভূত চাপল
আমার মাথায়—

খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম
ছোটবেলার মেঘের মাঠে
গিয়েই দেখি চেনা মুখ তো
একটিও নেই এ-তল্লাটে

একজনকে মনে হল
ওরই মধ্যে অন্যরকম
এগিয়ে গিয়ে বলি তাকেই !
"তুমিই কি সেই ? মেঘবালিকা
তুমি কি সেই ?"

সে বলেছে, "মনে তো নেই
আমার ওসব মনে তো নেই।"
আমি বললাম, "তুমি আমায়
লেখার কথা বলেছিলে—"
সে বলল, "সঙ্গে আছে ?
ভাসিয়ে দাও গাঁয়ের ঝিলে !
আর হ্যাঁ, শোনো—এখন আমি
মেঘ নই আর, সবাই এখন
বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়।"
বলেই হঠাৎ এক পশলায়—
চুল থেকে নখ—আমায় পুরো
ভিজিয়ে দিয়ে—
অন্য অন্য
বৃষ্টি বাদল সঙ্গে নিয়ে
মিলিয়ে গেল খরস্রোতায়
মিলিয়ে গেল দূরে কোথায়
দূরে দূরে···

"বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়
বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়—".
আপন মনে বলতে বলতে
আমি কেবল বসে রইলাম
ভিজে একশা কাপড়জামায়
গাছের তলায়
বসে রইলাম
বৃষ্টি নাকি মেঘের জন্য

এমন সময়
অন্য একটি বৃষ্টি আমায়
চিনতে পেরে বলল, "তাতে
মন খারাপের কী হয়েছে !
যাও ফিরে যাও—লেখো আবার।

এখন পুরো বর্ষা চলছে
তাই আমরা সবাই এখন
নানান দেশে ভীষণ ব্যস্ত।
তুমিও যাও, মন দাও গে
তোমার কাজে—
বর্ষা থেকে ফিরে আমরা
নিজেই যাব তোমার কাছে।"

এক পৃথিবী লিখব আমি
এক পৃথিবী লিখব বলে
ঘর ছেড়ে সেই বেরিয়ে গেলাম
ঘর ছেড়ে সেই ঘর বাঁধলাম
গহন বনে
সঙ্গী শুধু কাগজকলম

একাই থাকব। একাই দুটো
ফুটিয়ে খাব—
দু-এক মুঠো
ধুলো বালি—যখন যারা
আসবে মনে
তাদের লিখব
লিখেই যাব।

এক পৃথিবীর একশোরকম
স্বপ্ন দেখার
সাধ্য থাকবে যে-রূপকথার—
সে-রূপকথা আমার একার।

ঘাড় গুঁজে দিন
লিখতে লিখতে
ঘাড় গুঁজে রাত
লিখতে লিখতে
মুছেছে দিন—মুছেছে রাত
যখন আমার লেখবার হাত
অসাড় হল,
মনে পড়ল
সাল কি তারিখ, বছর কি মাস
সেসব হিসেব
আর ধরিনি
লেখার দিকে তাকিয়ে দেখি
এক পৃথিবী লিখব বলে
একটা খাতাও
শেষ করিনি।

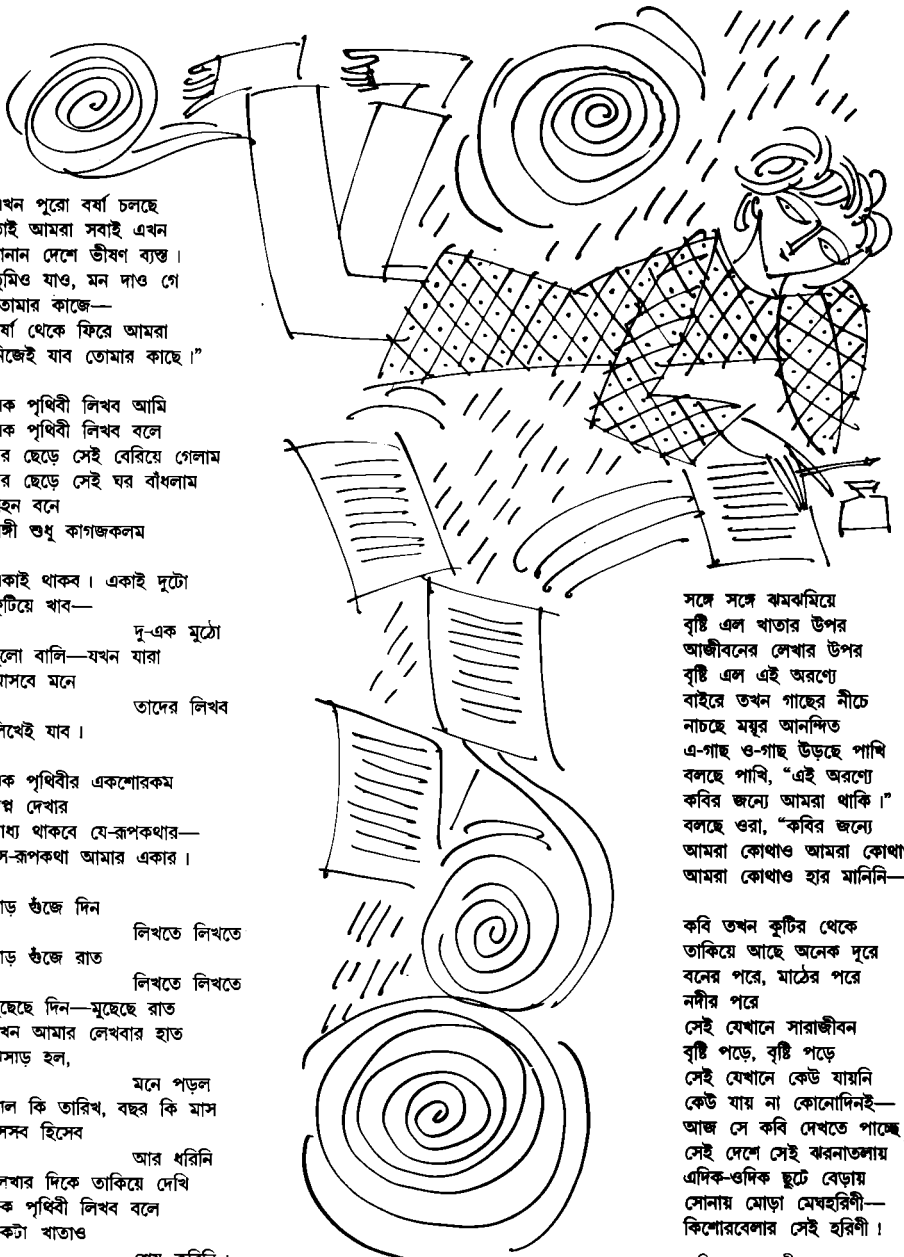

সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে
বৃষ্টি এল খাতার উপর
আজীবনের লেখার উপর
বৃষ্টি এল এই অরণ্যে
বাইরে তখন গাছের নীচে
নাচছে ময়ূর আনন্দিত
এ-গাছ ও-গাছ উড়ছে পাখি
বলছে পাখি, "এই অরণ্যে
কবির জন্যে আমরা থাকি।"
বলছে ওরা, "কবির জন্যে
আমরা কোথাও আমরা কোথাও
আমরা কোথাও হার মানিনি—"

কবি তখন কুটির থেকে
তাকিয়ে আছে অনেক দূরে
বনের পরে, মাঠের পরে
নদীর পরে
সেই যেখানে সারাজীবন
বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে
সেই যেখানে কেউ যায়নি
কেউ যায় না কোনোদিনই—
আজ সে কবি দেখতে পাচ্ছে
সেই দেশে সেই ঝরনাতলায়
এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়
সোনায় মোড়া মেঘহরিণী—
কিশোরবেলার সেই হরিণী!

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বিশ্ববিচিত্রা

জর্জ এভারেস্ট

নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল জর্জ এভারেস্টের জন্মের দুশো বছর। সেই এভারেস্ট, যাঁর নামে রাখা হয়েছিল হিমালয়ের অজানা এক পাহাড়চূড়ার নাম।

লিখেছেন অশোক সেনগুপ্ত

জর্জ এভারেস্টের ২০০ বছর পূর্ণ হল। বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম রাখা হয়েছে প্রাক্তন এই সার্ভেয়ার জেনারেলের নামে। কিন্তু জর্জ এভারেস্টের সম্পর্কে আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না। জানি না সেকালের সার্ভের পদ্ধতি এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ খুঁজে পাওয়ার কাহিনী। ইংরেজরা এদেশে এসেছিলেন মূলত শাসন ও শোষণ করতে। এ কারণে তাঁরা সার্ভের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এ শহরে তৈরি হল 'সার্ভে অব ইন্ডিয়া'। পরবর্তীকালে এল জিওলজিক্যাল, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল, মেটেরিওলজিক্যাল সার্ভে সংস্থাগুলি। সবগুলিরই জন্ম কলকাতায়। আর এসব কাজকর্ম করার জন্য যেসব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দরকার হত, সেগুলির প্রয়োজন মেটাতে লায়নস রেঞ্জে তৈরি হল ম্যাথমেটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস। দু-তিনটি জায়গা ঘুরে সংস্থাটি এখন জায়গা করে নিয়েছে যাদবপুরে ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস নামে।

জর্জের জন্ম ১৭৯০ সালের ৪ জুলাই। ওয়েলস্-এর ব্রেকনকশায়ারে। বাবা-দাদারা সকলেই ছিলেন সুপরিচিত। জরিপের কাজে বিজ্ঞানীদের সাহায্যের জন্য 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে'র ওপর তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। ১৮০৬ সালে ইংল্যান্ডের উল উইচে সামরিক স্কুলে এঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে জর্জ ওই সালেই যোগ দিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানিতে। সাত বছর তিনি বাংলায় কাটান। জাভার জরিপের জন্য দু' বছর (১৮১৪-১৮১৬) কাটিয়ে আবার এদেশে ফেরেন। এর পর প্রায় ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের জরিপের কাজে সুদূরপ্রসারী কিছু কাজকর্ম করেন জর্জ। ১৮২৩ সালে তিনি হলেন সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ১৮৩০ সালে সার্ভেয়ার জেনারেল। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে আছে হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত পটভূমির মধ্যরেখার পরিমাপ, টেলিগ্রাফ লাইন, জরিপের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মনোনয়ন প্রভৃতি। সেকালে জলপথ ছিল যাতায়াতের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। বিভিন্ন নদীতে গাছ পড়ে মাঝে-মাঝে

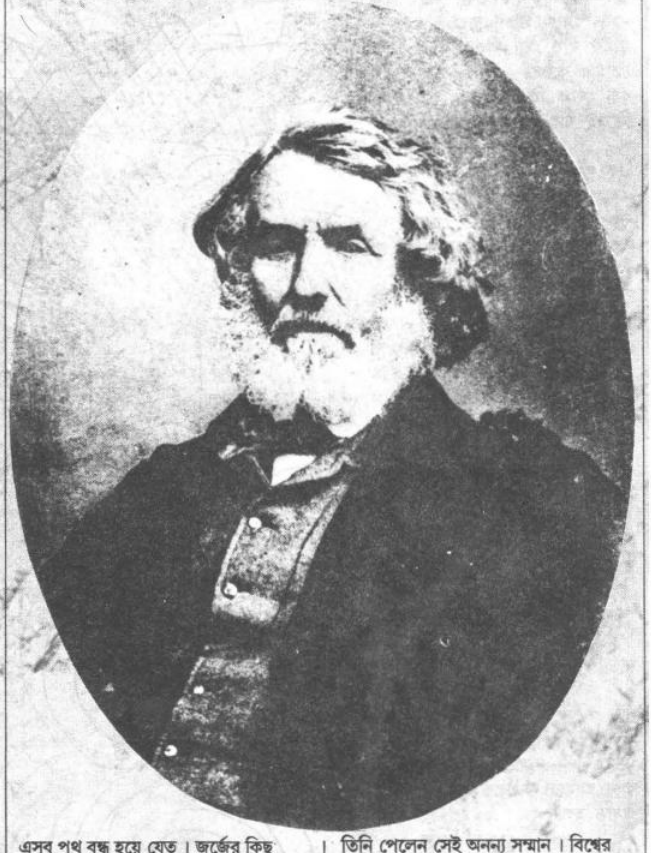

এসব পথ বন্ধ হয়ে যেত। জর্জের কিছু সুপারিশ কার্যকর করে প্রশাসনের কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে সুফল পেয়েছিলেন।

১৮২৭ সালে জর্জ রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' হন। ১৮৪৩ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন ইংল্যান্ডে। ১৮৬১ সালে পেলেন 'সার' উপাধি। ১৮৬৫ সালে তিনি পেলেন সেই অনন্য সম্মান। বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নামের সঙ্গে চিরকালের জন্য জড়িয়ে গেল এভারেস্টের নাম। ১৮৬৬ সালের ১ ডিসেম্বর লন্ডনে মারা যান তিনি। মাউন্ট এভারেস্টের হদিস মিলল কীভাবে? সার্ভে অব ইন্ডিয়ার টেকনিক্যাল অফিসার সত্যেন্দ্রমোহন দত্ত জানান, পাহাড়চূড়া মাপার

কাজ শুরু হয়েছিল ১৮২৩ সাল নাগাদ। সংস্থার সার্ভেয়াররা তরাই এবং নেপালের জঙ্গলে গিয়ে নানাভাবে মাপজোখ নিচ্ছিলেন। পরে দফতরে বসে চলত সেসব সমীক্ষার পর্যালোচনা। এভাবে একদিন পাওয়া গেল অচেনা একটি চূড়ার খোঁজ। যার নাম দেওয়া হয় 'পিক নাম্বার ১৫'। ১৮৫২ সালে দেরাদুনে সংস্থার দফতরে পাহাড়চূড়ার তুলনামূলক সমীক্ষা করতে-করতে আচমকা আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। ছুটতে-ছুটতে তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল (১৮৪৩-১৮৬১) অ্যান্ড্রু ওয়াগকে বললেন, "ওহ্ সার, আই হ্যাভ ডিসকভারড দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড।" এর আগে রাধানাথবাবুর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত 'অক্সিলিয়ারি টেবিল', যা মানচিত্র-বিজ্ঞানকে এক ধাপে অনেকটা এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ওয়াগ

জর্জ এভারেস্ট ১৮৩৩ সালে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে'র সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে কলকাতায় আসেন। সঙ্গে আনেন ৩৬ ইঞ্চির একটি বড় থিয়োডোলাইট। এভারেস্ট এবং ল্যাম্পটন বুঝতে পেরেছিলেন, নেপালের জঙ্গলে ওই যন্ত্রকে ৩০ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতায় না বসানো গেলে উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা পরিমাপ করা কঠিন।

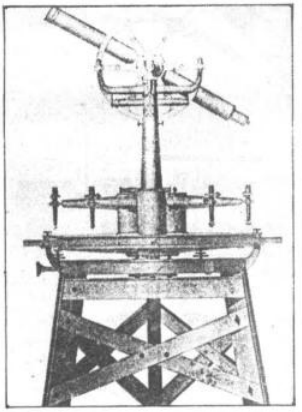

পাহাড়চূড়ার তুলনামূলক সমীক্ষা করতে করতে আচমকা আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন রাধানাথ শিকদার। ছুটতে-ছুটতে তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল অ্যান্ড্রু ওয়াগকে বললেন, "ওহ্ সার, আই হ্যাভ ডিসকভারড দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড।"

দেখলেন, রাধানাথের উল্লাসের সত্যিই কারণ আছে। হদিস মিলেছে পাহাড়চূড়ার। উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। পূর্বসূরি জর্জ এভারেস্টের স্মরণে নামকরণ হল সেই শৃঙ্গের।

সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অস্থায়ী আঞ্চলিক অধিকর্তা অসিতকুমার সেন জানান, পলাশির যুদ্ধের বছর-দশেক পর তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির কাজকর্ম আরও সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। আবাদযোগ্য বা বাসযোগ্য জমির জরিপ শুরু হল। এ-ব্যাপারে লন্ডন থেকেও নির্দেশ এল স্থানীয় কাউন্সিলের কাছে। ১৭৬৫ সালে এজন্য ডাক পড়ে জেমস রেনালের। ১৭৬৭ সালে তিনি হলেন প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল। ১২ বছরেরও কম সময়ে তিনি ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমাইল জায়গা জরিপ করে মানচিত্র প্রকাশ করেন। বাংলার ওই মানচিত্র তখন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। রেনালকে বলা হয় 'ভূগোল শাস্ত্রের জনক'। জর্জ এভারেস্টের কথা বলতে গেলে আরও একজনের প্রসঙ্গে বলতে হয়। তিনি হলেন উইলিয়াম ল্যাম্পটন। ১৭৫৩ সালে ইংল্যান্ডের ডারহামে তাঁর জন্ম বলে অনুমান করা হয়। তিনিই এদেশে 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে'র (জি টি এস) প্রবর্তক। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের পর ১৮২১ সালে এদেশেও ওই সার্ভে-রীতি চালু হয়। পাহাড়চূড়া মাপার ক্ষেত্রে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, চৌম্বকক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ণয় করা দরকার। এ-কারণে জি টি এস্ খুবই দরকারি। ১৮২৩ সালের ২০ জানুয়ারি ৭০ বছর বয়সে ল্যাম্পটন মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন জর্জ এভারেস্ট। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জি টি এস-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে কলকাতায় আসেন। সঙ্গে আনেন ৩৬ ইঞ্চির একটি বড় থিয়োডোলাইট। এভারেস্ট এর আগে ১৮১৮ সালে হায়দরাবাদে ল্যাম্পটনের প্রধান সহকারী হয়ে বছর-পাঁচেক কাজ করেছিলেন। এভারেস্ট এবং ল্যাম্পটন বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝতে পেরেছিলেন, নেপালের জঙ্গলে ওই যন্ত্রকে ৩০ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতায় না বসানো গেলে উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা পরিমাপ করা কঠিন।

কৃষি গবেষক শম্পা মুখার্জি জানান, মাউন্ট এভারেস্ট বা জর্জ এভারেস্টের সম্পর্কে আলোচনায় অনেক সময় একজন অসাধারণ দক্ষ মানুষের কথা অনুল্লেখ্য থেকে যায়। তিনি হলেন সৈয়দ মহম্মদ মহসিন। আর্কটের (কর্নাটক) এই কারিগর সাহেবদের সেকালের নষ্ট হয়ে যাওয়া বা পরিত্যক্ত বড়-বড় যন্ত্রপাতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেন। সূক্ষ্মভাবে নকল করার এক অসাধারণ প্রতিভা ছিল তাঁর। বহু দুরূহ মেরামতির কাজ সফলভাবে তিনি করেছিলেন। প্রতিভাবলে একজন সাধারণ শ্রমিক থেকে তিনি সার্ভে অব ইন্ডিয়ার একজন কর্মকর্তা হয়েছিলেন। জর্জ এভারেস্ট বা তখনকার অনেক সার্ভেয়ারের কৃতিত্বের আড়ালে এই বাঙালির কীর্তি অস্বীকার করা যায় না।

বিজ্ঞান যেখানে যা হচ্ছে

রহস্যময় আলো

আকাশে গাঢ় মেঘ। চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। করাতের দাঁতের মতো ডেভিস পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে উত্তরে বয়ে চলেছে তীব্র বাতাস।

টেক্সাসের মার্ফায় ধুলোময় কাঁচা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন মানুষ। মার্ফার রহস্যময় আলো দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। এই ভৌতিক আলোর গোলক নাকি একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে দেখা যায় মার্ফায়। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে মার্ফার সীমান্ত থেকে শিনাটি পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত যে-কোনও জায়গায় দাঁড়ালেই দেখা যেতে পারে এই আলো। কিন্তু কোনদিক থেকে যে রহস্যময় আলোর গোলক হঠাৎই দেখা দেবে তা কেউ বলতে পারে না। মার্ফার আলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন জেমস ক্রকার ও মার্টিন হ্যাফারটেপ। ওঁদের মতে, অনেক সময় লোকে দূরের পথ ধরে ছুটে আসা মোটরগাড়ির আলোকেও ভৌতিক আলো বলে ভুল করে।

কিন্তু একানব্বই বছরের বৃদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দা হ্যালি স্টিলওয়েল বলেছেন, ১৯১৬ সালেও এই আলো তিনি দেখেছেন। তখন মার্ফায় না ছিল মোটরগাড়ি না ছিল বিজলি বাতি।

ক্রকার ও হ্যাফারটেপ প্রথম এই আলো দেখেন ১৯৮৬ সালের মে মাসে। ওঁদের বর্ণনায়, জলের ফোঁটার মতো চেহারার গাঢ় হলুদ রঙের একটা বাতি যেন লাফিয়ে উঠল দিগন্তে। ক্রকার এই আলোর ছবিও তুলেছেন। কিন্তু রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। মার্ফার রহস্যময় আলো প্রতি বছরে বহু পর্যটককেই আকর্ষণ করে। তবে অনেকের ধারণা, বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণের মাধ্যমে দেখা তারা বা গ্রহকেই হয়তো অনেকে রহস্যময় আলো বলে ভুল করে।

বুদ্ধিমান রেডিও

সনি কর্পোরেশন তৈরি করেছে আধুনিক যুগের এই 'বুদ্ধিমান' রেডিও। সাধারণত মালটিব্যান্ড রেডিওর যাবতীয় গুণাগুণ তো এর আছেই, উপরন্তু রয়েছে বাড়তি অনেক অসাধারণ গুণ। এর সঙ্গে রয়েছে একটা বিল্ট-ইন-প্রিন্টার। ফলে এই যন্ত্র রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রচারিত কোনও টেলিটাইপ বার্তা সহজেই গ্রহণ করে ছাপিয়ে দিতে পারে কাগজে। এ ছাড়া ছাপতে পারে আবহাওয়া মানচিত্র, বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার খবর, কিংবা অর্থনীতির দুনিয়ার কোনও জরুরি তথ্য। সোজা কথা, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে সাধারণত যেসব বার্তা প্রচারিত হয় এই যন্ত্র সেইসব তথ্য গ্রহণ করে ছাপিয়ে দিতে পারে। এই কাজের জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টেনা। বোঝাই যাচ্ছে, বহুগুণে গুণান্বিত এই যন্ত্র খুব একটা সুলভ হওয়া সম্ভব নয়। ফলে এর দাম যে সাড়ে ছ' হাজার ডলার, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

উইজার্ড

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে আর কোনও বাধা নেই। না, এর জন্য একগাদা কাগজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না। শুধু 'শার্প' কম্পানির নতুন চমক 'উইজার্ড' সঙ্গে নিয়ে বেরোলেই হবে। এই ইলেকট্রনিক অর্গানাইজার যেসব কাজ করতে পারে তার কয়েকটি হল : অঙ্ক কষা, অনুবাদ করা, ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় সঞ্চিত তথ্য প্রয়োজনে দ্রুত হাজির করা, কাজের তালিকা মনে করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। উইজার্ডের বিভিন্ন কাজের জন্য রয়েছে বিভিন্ন সফটওয়্যার কার্ড। প্রয়োজনমতো নির্দিষ্ট সফটওয়্যার কার্ডটি যন্ত্রে ঢুকিয়ে দিলেই হল। উইজার্ডের লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে পরদায় ফুটে উঠবে দরকারি লেখাগুলো। এ ছাড়া উইজার্ডকে স্রেফ প্লাগ গুঁজে জুড়ে দেওয়া যায় আই বি এম পিসি কমপ্যাটিবল বা ম্যাকিনটশ কম্পিউটারের সঙ্গে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, উইজার্ডের 'এইট ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রানস্লেটর' কার্ডের কথা। এতে যে-আটটি ভাষায় অনুবাদের কাজকর্মের সুবিধে রয়েছে সেগুলো হল : ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, সুইডিশ, জাপানি ও চাইনিজ। এই কার্ডে বাড়ির কথাবার্তা, সাধারণ কথাবার্তা, শুভেচ্ছাবার্তা ইত্যাদির জন্য ভিন্ন-ভিন্ন বোতাম তো রয়েছেই—এ ছাড়া ব্যস্ত মানুষের সুবিধের জন্য রয়েছে বিমান-ভ্রমণ, হোটেল, কাস্টমস, রেস্তরাঁ, ডাক্তার ডাকা, বিনোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত কথাবার্তার জন্য নির্দিষ্ট বোতাম। এমনকী, জরুরি অবস্থা সামলানোর জন্যও রয়েছে আলাদা বোতাম।

কোনও একটি ভাষায় নির্দিষ্ট কথাটি নির্বাচন করে কোন ভাষায় সেই

কগনাইজার কে অফ না করা গেলেও তাকে ঘুম পাড়ানো

কগনাইজার

সিন্টনিক সিস্টেমস-এর প্রথম কর্মীকে কার্লোস ট্যাপাঙ বলেছেন, "দেখবে প্রতিদিন ওরা যেন অন্তত আট ঘন্টা ঘুমোতে পারে। আর যাই করো না কেন, ওদের প্লাগ খুলে দিও না, ওরা মরে যাবে।"

অরিগঁর এই কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ট্যাপাঙ এই উপদেশ দিতে পারেন তাঁর তৈরি 'কগনাইজার' সম্পর্কে। মানুষের চিন্তাভাবনার ধরনের অনুকরণে 'চিন্তাশীল' এই যন্ত্র কার্লোস ট্যাপাঙের মানসপুত্র।

সম্প্রতি কম্পিউটারের মাধ্যমে মস্তিষ্কের প্রাথমিক কার্যকলাপগুলো অনুকরণ করা গেছে। কৃত্রিম নার্ভ বর্তনি বা আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক তারই ফসল। চেকের সই বা হাতের লেখা চিনে নেওয়ার কাজে ব্যাঙ্ক এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বেশ কয়েক বছর ধরেই। শেয়ার বাজারের দামের ওঠা-নামা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হচ্ছে এরই সাহায্যে। আর আধুনিক হাইটেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বা বন্ধু চিনে নেওয়ার কাজে এর মিলিটারি ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আগামী প্রজন্মের 'বুদ্ধিমান' যন্ত্র কগনাইজার শুধু মানুষের বিচারবুদ্ধিকে নকলই করবে না, তারা নিজেরাও 'চিন্তাভাবনা' করতে পারবে।

ট্যাপাঙের আশা নব্বইয়ের দশকের মধ্যেই কগনাইজার মাইক্রোচিপ বাজারে ছাড়া যাবে এবং যে-কোনও কম্পিউটারকেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকবে এই চিপের। ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে এই চিপ তথ্য সঞ্চয় করে রাখবে তার স্মৃতিতে। তবে সুইচ অফ করে দিলেই তার সমস্ত স্মৃতি মুছে যাবে। সুতরাং একবার অন করলে ট্যাপাঙের মাইক্রোচিপ কখনও আর অফ করা যাবে না। ট্যাপাঙের কথায়, "প্রথম এই চিপের সুইচ অন করা মানে যেন জন্মগ্রহণ করা। ব্যস, তখন থেকেই পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দেবে এই চিপ···। কিন্তু যদি কেউ এর সুইচ অফ করে দেয় তা হলে

কথাটি অনুবাদ করতে চাই সেটা উইজার্ডকে প্রথমে জানিয়ে দিতে হবে। তারপর সফটওয়্যার কার্ডের 'ট্রানস্লেট' বোতামটি দিলেই হল। অনূদিত কথাটি ফুটে উঠবে এল-সি-ডি পরদায়।

আবার 'টাইম এক্সপেন্স ম্যানেজার' সফটওয়্যার কার্ড জমা-খরচের হিসেব দেখাতে পারে। কোনও দরকারি রিপোর্ট তৈরি করতে পারে। কোন সময়ে কোন কাজ করার কথা সেটা মনে করিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া অঙ্ক কষতে পারে দরকারমতো।

এইরকম আশ্চর্য যন্ত্রের তথ্য ছাপিয়ে নেওয়ার জন্য কোনও প্রিন্টার নেই বটে, তবে সেই কাজটি সেরে নেওয়া যায় যে-কোনও পার্সোনাল কম্পিউটারের প্রিন্টারের সাহায্যে।

সুতরাং চেহারায় ছোট হাত-বাক্সের মতো হলেও উইজার্ডের ক্ষমতা সত্যিই অতুলনীয়।

নতুন ওয়ার্ড প্রসেসর

ইদানীং ওয়ার্ড প্রসেসিং ব্যাপারটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে। অর্থাৎ, কোনও কিছু পার্সোনাল কম্পিউটারে টাইপ করে তারপর কম্পিউটারের টিভি পরদা থেকে সেটা পড়ে নেওয়া যায়। তারপর দরকারমতো ভুলচুক শুধরে নিয়ে ছাপিয়ে নেওয়া হয় কম্পিউটারের প্রিন্টারে। কিন্তু শুধু ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করলে অনর্থক খরচ হয় বেশি। অথচ অনেকেই তাই করে থাকেন।

এই সমস্যার সমাধান করতে কানাডার স্মিথ করোনা কর্পোরেশন বের করেছেন 'পার্সোনাল ওয়ার্ড প্রসেসর'।

এর সঙ্গে রয়েছে একষট্টি বোতামের কি বোর্ড, পঞ্চাশ হাজার অক্ষর বা চিহ্ন সঞ্চয় করে রাখতে পারে এমন স্মৃতিকোষ, এক লক্ষ অক্ষর বা চিহ্ন সঞ্চয় করে রাখতে পারে এমন ডেটাডিস্ক, স্মিথ করোনার বিশেষ সফটওয়্যার প্যাকেজ 'গ্রামার রাইট সিস্টেম', উপযুক্ত ভিসুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট, ডুয়াল ফ্লপি ড্রাইভ ইত্যাদি।

যাঁরা শুধুমাত্র ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে কাজ করতে চান তাঁদের জন্য এই পার্সোনাল ওয়ার্ড প্রসেসর একেবারে আদর্শ যন্ত্র।

বে··· কগনাইজার মানুষের আচার-আচরণকে অনুকরণ করে তৈরি···

সেটা হবে অনেকটা কোনও মানুষকে খুন করে ফেলার মতো।"

কগনাইজারকে সর্বক্ষণ অন করে রাখতে বিদ্যুৎ খরচ খুব একটা বেশি হবে না। এর সঙ্গে উপযুক্ত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে সমস্ত তথ্যকে সজীব রাখা যাবে। আধুনিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেসব জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কগনাইজার সহজেই তার সমাধান করে ফেলবে। এইরকম একটি সমস্যা হল মানুষের দৃষ্টিশক্তির মূল রহস্যকে অনুকরণ করা। কগনাইজারকে অফ না করা গেলেও তাকে ঘুম পাড়ানো যাবে। ওদের ঘুমের দরকার। কারণ কগনাইজার মানুষের আচার-আচরণকে অনুকরণ করে তৈরি। ওদের ঘুম পাড়ানোর উপায় হল ওদের 'চোখ' বুজিয়ে দেওয়া, আর অন্যান্য সেন্সরকেও আবৃত করে রাখা। এই সেন্সর বা কৃত্রিম ইন্দ্রিয়গুলোই বাইরের দুনিয়া থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কগনাইজারকে জানায়।

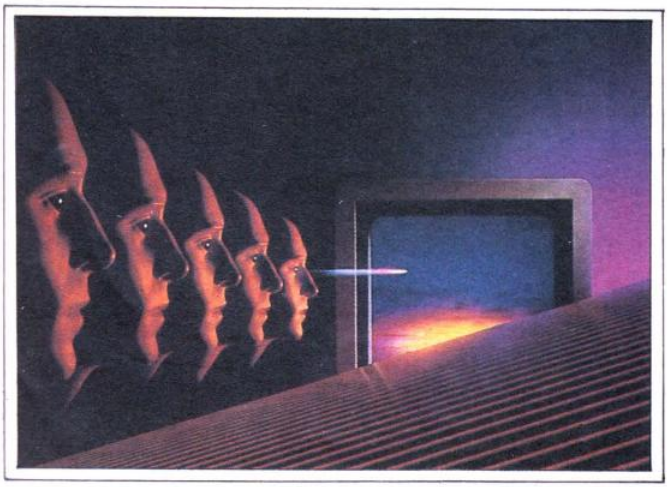

সারা জীবনে একজন মানুষের আচার-আচরণ পালটায়। বিভিন্ন ঘটনা, দুর্ঘটনা, স্মৃতি বিলোপ ইত্যাদিই এর কারণ। এই বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা হলেও নিশ্চিত কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারে এমন তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত গরহাজির। কগনাইজারদের ক্ষেত্রে এরকম কোনও সমস্যা নেই। কারণ ওদের এককণা স্মৃতিও কখনও লোপ পায় না। বরাবর ওরা একইরকম থাকে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, কল্পবিজ্ঞানের গল্পে কল্পনা করা হয়েছে এমন বহু যন্ত্রই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এবারে কার্লোস ট্যাপাঙের কগনাইজারের পালা।

মাদাম তুসোর মোমের মানুষ

লন্ডন শহরের অন্যতম আকর্ষণ মাদাম তুসো-র জাদুঘর। মোমের তৈরি মানুষপ্রমাণ সব মূর্তি এখানে যেন জীবন্ত! এই জাদুঘরের মতোই অসাধারণ তার স্রষ্টা মাদাম তুসোর জীবন। লিখেছেন গৌতম চক্রবর্তী।

আরাফত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। পি· এল· ও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন)-এর অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসর আরাফত। তিনি জানতেন না, ১৯৯০ সালে তাঁর জন্য লন্ডন শহরে এরকম তীব্র এক চমক অপেক্ষা করছে।
আরাফতের কয়েক হাত দূরেই দাড়িয়ে আছেন আর-এক আরাফত। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে ভর্তি সহাস্য মুখ, মাথায় স্কার্ফ। রহস্যময় কোনও এক আয়না ভেঙে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছেন দ্বিতীয় এক ইয়াসর আরাফত।

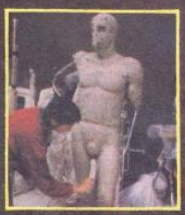
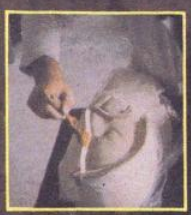

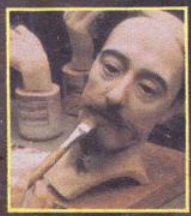

এইভাবেই ধাপে-ধাপে এগোয় মূর্তি তৈরির পালা

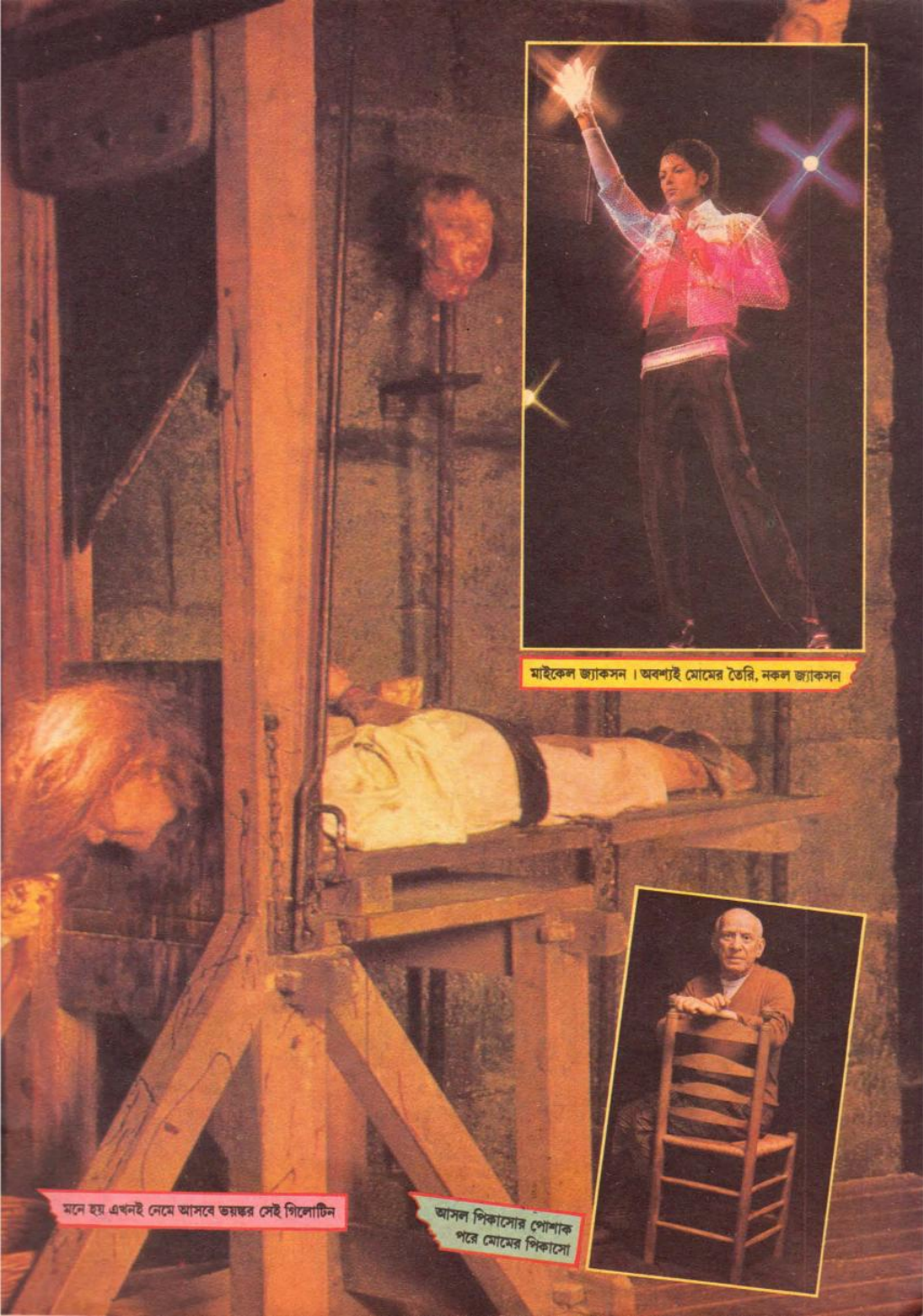

মাইকেল জ্যাকসন । অবশ্যই মোমের তৈরি, নকল জ্যাকসন

মনে হয় এখনই নেমে আসবে ভয়ঙ্কর সেই গিলোটিন

আসল পিকাসোর পোশাক পরে মোমের পিকাসো

আরাফত কি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন ? তুলারি প্রাসাদে সম্রাট নেপোলিয়ন এভাবেই দেখেছিলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর-একজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ! লন্ডনের মেরিলিবোন রোডের এই বাড়িতে এসে আরাফত যদি বিস্মিত হন, প্রিন্স চার্লস তা হলে নিশ্চয়ই হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়েছিলেন, স্ত্রী ডায়নাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলেছিলেন, "ওই যে, মা !" ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ফুটফুটে এক উচ্ছল বালিকা। ওই বালিকাই প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়িয়ে আজকের মহারানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। প্রিন্স চার্লসের মা ! স্বয়ং মহারানি যদি তাঁর বাল্যকাল নিয়ে উপস্থিত হন, তা হলে অন্যান্যরাই বা বাকি থাকেন কেন ? মেরিলিবোন রোডের এই বাড়িতে ঢুকলে সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। আলফ্রেড হিচকক থেকে শুরু করে ব্রিজিত বার্দো, মাইকেল জ্যাকসনের মতো সুপারস্টাররাও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। উইনস্টন চার্চিলের মাত্র কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন আজকের হি-ম্যান বা 'র‍্যাম্বো' সিলভেস্টার স্ট্যালোন। রাজনীতিতে যাঁকে 'লৌহমানবী' বলা হয়, সেই মার্গারেট থ্যাচারও এখানে আছেন তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

পপ সঙ্গীতের জীবন্ত নায়ক : বয় জর্জ

সেই লেনন, সেই ম্যাককার্টনি ! পিয়ানোর সামনে বিটল্‌স দল

বাঁ দিকে বসে আছেন চার্লস ডিকেন্স, ডান দিকে হান্স অ্যান্ডারসন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে শেক্‌সপিয়র

লৌহমানবী থ্যাচারের কাছে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি বা টর্চ ধরা বারণ। তা হলে উনি ক্রমশ গলে গলে পড়তে থাকবেন, নিঃশেষ হয়ে যাবেন। মেরিলিবোন রোডের এই বাড়িতে মার্গারেট থ্যাচার আদতে কানও লৌহমানবী নন, বরং তাঁকে বলা যেতে পারে 'মোমমানবী'। মোম দিয়ে গড়া মূর্তি।
পাবলো পিকাসো, থ্যাচার, চার্চিল, স্ট্যালোন, জ্যাকসন, রানি এলিজাবেথ—সবাই এখানে মোমের মানুষ। মোম দিয়ে গড়া জীবন্ত অবয়ব।
লন্ডন শহর এবং মোম দিয়ে গড়া বিখ্যাত সব মানুষ! কারও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় আমরা এতক্ষণে কোথায় ঢুকে পড়েছি। হ্যাঁ, মাদাম তুসোর বিশ্ববিখ্যাত জাদুঘরে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি।
মাদাম তুসো বলতেই অনেকের ধারণা, মানুষের মতো বিশাল সব মোমের মূর্তি। তারা কথা বলে না, হাঁটাচলা করে না, শুধুমাত্র নিজের পাদপীঠের ওপর স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একেবারেই ভুল। জন লেনন এখানে আজও গান গেয়ে শোনান, পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত মহম্মদ আলি এখনও এখানে বিদ্যুদ্বেগে ঘুসি মারেন, মেরিলিন মনরো এখনও তাঁর লাস্যময়ী ভঙ্গিতে, লঘুচপল ছন্দে ঘুরে বেড়ান।
না, এটা ভূতের গল্প নয়। চোখে-দেখা বাস্তব। মাদাম তুসোর এই জাদুঘরে ১৯৬৭ সালে তৈরি হয়েছিল 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'। আলো ও শব্দের বৈজ্ঞানিক চাতুরিতে এখানে আজও দেখা যায় জীবন্ত জন লেনন ও মেরিলিন মনরোকে। চোখের সামনে আচমকা ঘটে যায় ঐতিহাসিক ট্রাফালগার যুদ্ধ। কালো জলের স্রোত ভেঙে এগিয়ে যেতে থাকে মধ্যযুগের পালতোলা যুদ্ধজাহাজ, কামান থেকে ছিটকে বেরোতে থাকে আগুনের গোলা। খোলা তরবারি হাতে একটু পরেই ডেকে এসে দাঁড়ান অ্যাডমিরাল নেলসন। সেই নেলসন, ছেলেবেলায় যিনি অদ্ভুত বিস্ময়ে ঠাকুমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "ভয়! ভয় কাকে বলে ঠাকুমা?"
চোখের সামনে ইতিহাসের এই অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি দেখলে নেলসন ভয় পেতেন কি না জানি না, তবে নিশ্চয় তাঁর গা ছমছম করে উঠত। অশরীরী এক আতঙ্কে খাড়া হয়ে উঠত গায়ের রোম।
না, নেলসন কখনও মাদাম তুসোর জাদুঘরে 'আতঙ্ক-কক্ষ' বা 'চেম্বার অব হররস্'-এ ঢোকেননি। ১৮৪৬ সালে চালু হয়েছিল এই চেম্বার অব হররস্! আজও এখানে রয়েছে গিলোটিন, সম্রাট ষোড়শ লুই ও রানি মেরি আঁতোয়ানেতের 'ডেথ মাস্ক'। দেখা যাবে বার্ক ও হার্স নামে মধ্যযুগের দুই কুখ্যাত অপরাধীকে। গলায় ফাঁস দিয়ে এরা লোককে মেরে ফেলত, তারপর 'এডিনবরা মেডিকেল অকাদেমি'তে বিক্রি করত সেসব মৃতদেহ। এক-একটি মৃতদেহের দাম দশ পাউন্ড। বাথ টবে ভেসে আছে এক মৃতদেহ। ইনসিওরেন্সের টাকা পাওয়ার জন্য জর্জ পামার এভাবেই খুন করেছিল তার স্ত্রীকে। খুনি 'জ্যাক দ্য রিপার'-এর পাশেই আছে উইলিয়ম পামার। পামারের নেশা একটাই। বিভিন্নভাবে বিষপ্রয়োগ করে লোককে মেরে ফেলা। আছেন হিটলার স্বয়ং গ্যাস-চেম্বার নিয়ে।
পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত মানুষ আজ

জাদুঘরে আগাথা ক্রিস্টি

রহস্যময় মাদাম তুসোর জাদুঘরে এবার পা দিয়েছেন রহস্য-কাহিনীর রানি!
এ-বছর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আগাথা ক্রিস্টির জন্মশতবার্ষিকী উৎসব! এরক্যুল পোয়ারো ও মিস মার্পল-এর স্রষ্টা সেই আগাথা ক্রিস্টি! আনন্দের জোয়ারে গোটা লন্ডন শহর এখন 'আগাথা-জ্বর'-এ ভুগছে। আগাথা ক্রিস্টির সম্মানে সর্বত্র দেওয়া হচ্ছে বিপুল ও বর্ণাঢ্য ভোজসভা, রাস্তায় ছোঁড়া হচ্ছে দুর্দান্ত সব আতশবাজি। চেরিং-ক্রস টিউব স্টেশন বা হাইড পার্ক সর্বত্র ক্রিস্টিভক্তরা শুরু করে দিয়েছেন জমকালো সব উৎসবের আয়োজন। নতুন প্রজাতির এক গোলাপ ফুলের নাম রাখা হয়েছে 'আগাথা-গোলাপ'। ঠিক হয়েছে ক্রিস্টির জন্মস্থান টর্কে শহরে নিত্য যাতায়াত করবে 'ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস' নামের ট্রেনটি। সেই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, যাকে পটভূমিকায় রেখে আগাথা লিখেছিলেন বিশ্ববন্দিত এক রহস্য-উপন্যাস 'মার্ডার ইন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস'।
সমস্ত লন্ডন শহর যদি এভাবে উৎসবের জোয়ারে ভেসে যায়, তা হলে মেরিলিবোন রোডের জাদুঘরটাই বা বাকি থাকে কেন? আগামী এক বছর ধরে এখানে চলবে আগাথা ক্রিস্টিকে নিয়ে বিশেষ এক প্রদর্শনী। গুঁফো বেলজিয়ান গোয়েন্দা এরক্যুল পোয়ারোও বাদ যাবেন না, মানুষপ্রমাণ মূর্তিতে তাঁকেও দেখা যাবে এই প্রদর্শনীতে। দেখা যাবে, চেয়ারে বসে উল বুনছেন মোমের তৈরি জীবন্ত এক মিস মার্পল। চেয়ারে বসে উল বুনতে-বুনতেই তিনি শনাক্ত করে দিতে পারেন যে কোনও অপরাধীকে।
শুধু মিস মার্পল বা এরক্যুল পোয়ারো নন, বিশেষ এই প্রদর্শনীতে দেখা যাবে রহস্য-কাহিনীর রানি আগাথা ক্রিস্টির গোটা জীবন। ছোট্ট আগাথা ক্ল্যারিসা মিলারকে অঙ্ক শেখাচ্ছেন আগাথার বাবা ফ্রেডরিখ মিলার, বল নাচের আসরে তরুণ পাইলট আর্চি ক্রিস্টির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন তরুণী আগাথা— সব ঘটনাই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জীবন্ত এই প্রদর্শনীতে।
সন্দেহ নেই, মাদাম তুসোর জীবন্ত এই জাদুঘরের দৌলতে আরও এক বছর আগাথা-জোয়ারে ভেসে যাবেন পৃথিবীর মানুষ।

লন্ডনের এই জাদুঘরে উপস্থিত। কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি যখন স্মৃতির আড়ালে চলে যান, আর তাঁর নাম শোনা যায় না, তখন প্রদর্শনী থেকে সেই মূর্তিটিও সরিয়ে নেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে কম সময় ছিল কোন মূর্তি ? এ-প্রশ্নের উত্তরটা বেশ করুণ। মাইকেল ডুকাকিস। হ্যাঁ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের অন্যতম দাবিদার ডুকাকিসের মূর্তি এখানে ছিল মাত্র পাঁচ সপ্তাহ। এটাই সবচেয়ে অল্প সময়ের রেকর্ড। কিন্তু ডুকাকিসের প্রতিদ্বন্দ্বী জর্জ বুশ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন অন্তত চার বছর। এটা ইতিহাসের খেলা।

তুসো'র জাদুঘরের বর্তমান জনসংযোগ অফিসার জুলিয়েট সিম্পকিনসের মতে, "যাঁর মডেল গড়া হয়, তাঁকে চার থেকে পাঁচ মাস আগে খবর দেওয়া হয়। প্রথমদিন তাঁকে শুধু বসিয়ে রাখা হয়। সেদিন তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক আমরা বোঝার চেষ্টা করি। এর পর বিভিন্ন কোণ থেকে, নানাভাবে ওঁর ছবি তোলা হয়।"

এর পর মাটির মডেল থেকে প্লাস্টারে ছাঁচ তোলার পালা। মাথার ছাঁচটা কিন্তু অনেকগুলি অংশে বিভক্ত করে তৈরি করা হয়। প্লাস্টার শুকিয়ে গেলে মাটি থেকে সেটা তুলে গলন্ত মোম ঢালা হতে থাকে। মিনিট-চল্লিশেক পর গোল, ফাঁপা মাথা বসানো সুন্দর এক মূর্তি তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তী ধাপে আছেন এগারোজন হেয়ারড্রেসারের একটি দল। তাঁরা একজন বিক্রেতার কাছ থেকে আসল চুল কেনেন, এর পর মানুষটির চুলের স্টাইলের অনুকরণে ওই

MADAME TUSSAUD'S

মাদাম তুসো বলতেই অনেকের ধারণা, মানুষের মতো বিশাল সব মোমের মূর্তি। তারা কথা বলে না, হাঁটাচলা করে না, স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একেবারেই ভুল। জন লেনন এখানে আজও গান গেয়ে শোনান, রোগাক্রান্ত মহম্মদ আলি এখনও এখানে বিদ্যুদ্বেগে ঘুসি মারেন।

রাশিয়ায় মাদাম তুসো

মস্কোর সোকোলনিকি পার্কে মোমের মূর্তির এক আশ্চর্য জাদুঘরের কথা লিখেছেন পৌলমী সেনগুপ্ত

আইভান দ্য টেরিবল, আলেক্সান্ডার পুশকিন, জোসেফ স্ট্যালিন এবং মায়া প্লিসেত্স্কায়া— একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।

খবরটা শুনলে অবাক হতে হয়, কিন্তু এই ঘটনাটি নির্ভেজাল সত্যি। বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সময়ের বিখ্যাত এইসব মানুষকে একই জায়গায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উজ্জ্বল আলোর নীচে, ঝকঝকে পোশাক পরে, সুসজ্জিত মঞ্চে এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। সবকিছুই নিখুঁত, অভাব শুধু প্রাণের। পুশকিনের চোখের পলক পড়ছে না, নড়ছে না স্ট্যালিনের আঙুল, প্লিসেৎস্কায়ার দুটি হাত নাচের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। মনে হয় যে-কোনও মুহূর্তে এঁরা নড়ে উঠবেন, কথা বলবেন। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠছে না। অজানা এক জাদুকরের জাদুদন্ডের স্পর্শে প্রত্যেকে নিথর হয়ে আছেন। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। যেসব মানুষের নাম করা হল, এঁরা কেউ তো আর জীবন্ত নন। এঁরা প্রত্যেকেই আসলে মোমের মডেল। রাশিয়ার বিখ্যাত কিছু ব্যক্তিত্বের মোমের প্রতিকৃতিগুলি রয়েছে মস্কো শহরের এক প্রদর্শনীতে।

প্রদর্শনীটি মস্কো শহরে জেনে অনেকেই হয়তো একটু অবাক হবেন। কিন্তু এটাই আসলে চমকদার খবর।

'ওয়াক্স-মডেলিং'-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মাদাম তুসোর নাম। আর আমরা সবাই জানি যে, মাদাম তুসোর বিখ্যাত মোমের মিউজিয়াম রয়েছে লন্ডনে। সেখানে আছে সারা বিশ্বের বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের মোমের প্রতিকৃতি। লন্ডনের এই মিউজিয়ামের অনুকরণে মস্কোতে তৈরি হয়েছে একটি নতুন প্রদর্শনী।

মস্কোতে যেসব বিশাল পার্ক আছে, তাদের মধ্যে একটির নাম 'সোকোলনিকি'। এই সোকোলনিকি পার্কেই তৈরি হয়েছে নতুন মোমের মূর্তির প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করেছেন নিকোলাই জেলেনেৎস্কি। তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়ার দীর্ঘ ইতিহাস থেকে বাছাই করে এমন কয়েকজন মানুষের প্রতিকৃতি তৈরি করতে, যাঁদের নাম এখনও সোভিয়েত দেশের মানুষকে আকর্ষণ করে। তাঁর পরিকল্পনায় জেলেনেৎস্কি পুরোপুরি সফল।

আইভান দ্য টেরিবল ও পুশকিন

মস্কোর প্রদর্শনীতে আছে মোট ন'টি মোমের মূর্তি। এত কম মূর্তি দিয়ে তো আর একটা মিউজিয়াম তৈরি করা যায় না, তাই একে 'প্রদর্শনী' বলা ভাল। মূর্তিগুলি তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় এক বছর। শিল্পীদের নাম ব্রডস্কি এবং

মোমের ছাঁচে চুল বসানো হতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বেশিদিন ধরে চলে। চুলটা ঠিকমতো হল কি না, তার উপরেই নির্ভর করে মূর্তির সাফল্য।
চুল বসানোর পর লাগানো হয় চোখ। আগে সব চোখই কাঁচ দিয়ে তৈরি হত, এখন অ্যাক্রিলিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ছবিতে আসল মানুষের চোখের রং বারবার দেখে তারপর বসানো হয় এই নকল চোখ।
মোমের মুখ, দাড়ি, ভুরু এবার ওয়াশ করে অন্য জায়গা থেকে হাত, পা নিয়ে আসা হয়। সাধারণত মূর্তির মাথা, বুক ও হাত তৈরি হয়. মোম দিয়ে, বাকিটা ফাইবার গ্লাস দিয়ে। এই ফাইবার গ্লাসের সঙ্গে মোমের হাত, পা ও মাথা জুড়ে দিলেই মূর্তি শেষ। তারপর তাকে পোশাক পরানোর পালা।

ড্রেস-ডিজাইনারদের একটি দল তৈরি হয়েই থাকেন, তাঁরা উপযুক্ত পোশাক এই মূর্তিটিতে পরিয়ে দেন।
পিকাসোর মূর্তি গড়ার সময় এই ড্রেস-ডিজাইনারদের খুব একটা খাটতে হয়নি। মোমের পিকাসোর জন্য আসল পিকাসো তাঁর এক প্রস্থ পোশাক জাদুঘর-কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন।
সেই মোমের পিকাসো আজও আছে, আসল পিকাসোর পোশাক পরে।

কে এই মাদাম তুসো

অস্ট্রিয়ার স্ট্রাসবার্গ অঞ্চলে এখন হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। হ্রদের জল ইতিমধ্যেই জমে বরফ হতে শুরু করেছে।
আজ ৭ ডিসেম্বর, ১৭৬১। স্ট্রাসবার্গের স্থানীয় সেন্ট পিটারস ক্যাথলিক গির্জা থেকে বেরিয়ে এল একদল লোক। মুলেরিন এই অঞ্চলের নামকরা একজন ধাত্রী, তাঁর কোলে ছোট্ট এক শিশুকন্যা।
স্থানীয় সেন্ট পিটারস ক্যাথলিক গির্জায় এই ছোট্ট শিশুটিকে আজ দীক্ষিত করা হল, ওর নাম রাখা হয়েছে অ্যান মেরি গ্রসহল্‌তজ। অ্যানের মা আনা মারিয়া ওয়াল্ডার এই স্ট্রাসবার্গেরই বাসিন্দা, তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ থাকায় আজকের এই অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতে পারেননি।
ধাত্রী মুলেরিনের কোলে চেপে মাত্র ক'দিনের এই ছোট্ট শিশুটি আজ এসেছে দীক্ষিত হতে। ও জানে না, ওর জন্মের কয়েকদিন আগেই মারা গেছেন ওর বাবা জোসেফ গ্রসহল্‌তজ।

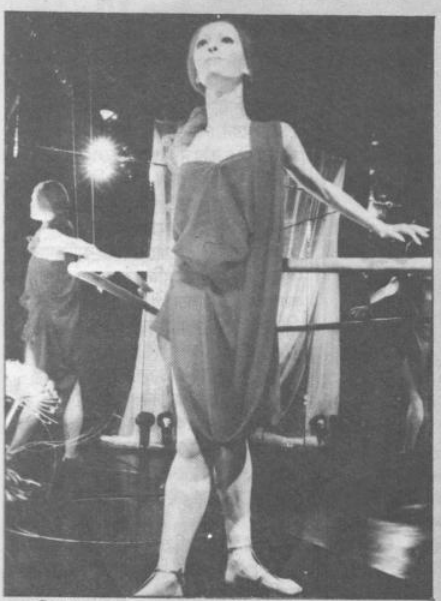

মায়া প্লিসেত্‌স্কায়া

কোগান। প্রত্যেকটি মূর্তিই আসল মানুষটির সমান মাপে গড়া হয়েছে, পরানো হয়েছে সত্যিকারের পোশাকপরিচ্ছদ। এ-সবই লন্ডনের মাদাম তুসোর প্রদর্শনীর মতো, কিন্তু মস্কোয় নতুনত্ব আনা হয়েছে মূর্তিগুলি সাজিয়ে রাখার পদ্ধতিতে। রাশিয়ার বিখ্যাত জার আইভান দ্য টেরিবল উপস্থিত আছেন। 'আইভান দ্য টেরিবল কিলস হিজ সন' এই নামী রাশিয়ান ছবিটির অনুকরণে নির্মিত হয়েছে জারের মডেল। দেখানো হয়েছে যে, তিনি একজনকে হত্যা করছেন। কিন্তু যাঁকে হত্যা করছেন জার আইভান, তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং লেখক আলেক্সান্ডার পুশকিন। জোসেফ স্ট্যালিন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর নিজের পোর্ট্রেটের সামনে। কাছেই দেখা যাবে তাঁর সহকারী লাভরেন্তি পাভলোভিচ বেরিয়াকে। তিনি সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশের প্রথম অধ্যক্ষ মালয়ুতা শুরাতভের সঙ্গে একহাত দাবা খেলে নিচ্ছেন। এ ছাড়াও দেখা যাবে লিওনিদ ব্রেজনেভকে। আছেন শেষ রুশ সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাস। প্রতিকৃতিগুলি সাজানোর পদ্ধতিতে আছে যে অবাস্তবতা—সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে আনাই তার প্রধান উদ্দেশ্য।

মাত্র ন'টি মোমের মডেল নিয়ে গড়ে তোলা এই ছোট্ট প্রদর্শনীটিকে আরও বড় করে তোলার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না। নিকোলাই জেলেনেৎস্কি বলেছেন যে, এই প্রদর্শনী দেখতে যদি যথেষ্ট ভিড় হয় এবং মানুষের মনে আগ্রহের সঞ্চার হয়, তবে পুরো ব্যাপারটাকে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। তখন হয়তো এখানে আসবেন সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন, শিক্ষাবিদ আন্দ্রেই শাখারভ বা সন্ত সারজির মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

লাভরেন্তি বেরিয়া

আশা করা যায়, আমরা অচিরেই মস্কোতে আর একটি 'মাদাম তুসোর মিউজিয়াম' দেখতে পাব। সোকোলনিকি পার্কের ছোট্ট এই প্রদর্শনী এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে আবার প্রমাণিত হল যে, রাশিয়ার মানুষের প্রিয় শহর মস্কো মূল ইউরোপের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র লন্ডন বা প্যারিসের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে না।

জোসেফ গ্রসহলতজ আসলে ফ্রাঙ্কফুর্টের বাসিন্দা, তিনি অস্ট্রিয়ার জেনারেল কাউন্ট ড্যাসোবার্টের এ·ডি·সি। অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার পক্ষে কাউন্ট ড্যাসোবার্ট এখন জড়িয়ে পড়েছেন যুদ্ধে। ইতিহাসে বিখ্যাত সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধ।

যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গিয়েছিলেন কাউন্ট ড্যাসোবার্টের এ·ডি·সি জোসেফ গ্রসহলতজ! এই ছোট্ট শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনও উপায় এখন দেখতে পাচ্ছেন না তরুণী আর মারিয়া ওয়াল্ডার।

স্ট্রাসবার্গ ছেড়ে আনা চলে এসেছিলেন বার্নে শহরে। হাউসকিপারের কাজও জুটে গিয়েছিল। বার্নে শহরে রয়েছেন এক তরুণ চিকিৎসক, তাঁর নাম ফিলিপ গুইলামি ম্যাথি কার্টিয়াস। আনা এই চিৎিসকের অগোছালো ঘর-গৃহস্থালি গুছিয়ে রাখার ভার পেয়েছেন। পাশ করবার পরেও কার্টিয়াসের ডাক্তারি

মাদাম তুসোর ক্যাটালগ, ১৮৯০

করায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, তিনি আসলে একজন শিল্পী। রাত জেগে মোমের সব মূর্তি তৈরি করেন। ডাক্তারি পড়ার কারণে অ্যানাটমিও তাঁর নখদর্পণে, ফলে তাঁর তৈরি-করা মূর্তির চোখ, মুখ, ভঙ্গি প্রায় জীবন্ত বলে বোধ হয়। মূর্তিশিল্পী হিসেবে এই অঞ্চলে তাঁর বেশ নামডাক আছে।

সুইজারল্যান্ডের এই বার্নে শহরে কার্টিয়াসের শিল্পসংগ্রহ দেখতে হাজির হলেন এক ফরাসি আগন্তুক। তাঁর নাম প্রিন্স ডি সেন্টি।

প্রিন্স ডি সেন্টি ফরাসি রাজবংশের সন্তান হলেও রাজা পঞ্চদশ লুই তাঁকে একদম সহ্য করতে পারেন না। ডি সেন্টির একজন বন্ধু দাঁ জ্যাকস রুশো কিছুদিন আগে 'এমিলি' নামে এক বই লিখে রাজরোষে পড়েছেন। ডি সেন্টি রুশোকে সুইজারল্যান্ডের বিয়েন হ্রদ অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রুশো ছাড়াও দার্শনিক দিদেরো এই রাজপুরুষের ব্যক্তিগত বন্ধু।

ডি সেন্টি মুগ্ধ হয়েছিলেন কার্টিয়াসের কৃতিত্ব দেখে। এই শিল্পীকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস শহরে।

কার্টিয়াস দু'বছর একাকী দাঁতে দাঁত চেপে থাকলেন প্যারিসে। তাঁর সাঁলো এখন বিখ্যাত, ডি সেন্টির সূত্রে তিনি রাজা পঞ্চদশ লুই, মাদাম দ্যু বারিরও মূর্তি গড়লেন। লাফায়েত, মিরাব্যো প্রমুখ ফরাসি অভিজাতরা তাঁর স্টুডিওতে এখন নিয়মিত যাতায়াত করেন। লাফায়েত প্রায়ই তাঁর এক আমেরিকান বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসেন, তার নাম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

ভারতে মাদাম তুসো

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বিস্মিত হতে পারেন মাদাম তুসোর ইতিহাস ঘাঁটিলে। লন্ডন শহরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঢের আগে মাদাম তুসো ভারতবর্ষ নামে একটি দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তখনও তিনি মাদাম তুসো হননি, কুমারী মেরি গ্রসহল্‌তজ নামেই তাঁর পরিচিতি।

মেরি গ্রসহল্‌তজ তখন ভার্সাই রাজপ্রাসাদে রাজকন্যা মাদাম এলিজাবেথের শিক্ষিকা। মহীশূরের টিপু সুলতানের রাজদরবার থেকে কয়েকজন দূতকে পাঠানো হয় সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের কাছে। টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বেন, তাই ফরাসিদের সাহায্য চান।

রানি মেরি আঁতোয়ানেত এই ভারতীয়দের একদিন নিয়ে গেলেন ভার্সাই প্রাসাদে মেরির স্টুডিওতে। ভারতীয়রা মানুষপ্রমাণ এই জীবন্ত মোমের মূর্তি দেখে কী করবে ভেবে পায় না, আসল ও নকলের সাদৃশ্যে তারা প্রায় হতভম্ব হয়ে যায়। বিস্ময়ে তারা একবার আসল মেরি আঁতোয়ানেতকে দেখতে থাকে, আর একবার তাঁর মোমের মূর্তিটিকে।

১৮০২ সালে মাদাম তুসো প্রথম লন্ডন শহরে পা রেখেছিলেন। ব্রিটিশরা সেবারই প্রথম দেখলেন জীবন্ত এই প্রদর্শনী। তারও সাত বছর আগে ১৭৯৫ সালে মাদাম তুসো নিজে প্রদর্শনীর জন্য কয়েকটি মূর্তি পাঠিয়েছিলেন ভারতে। ডমিনিক লরেন্সি এই প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করেছিলেন, কলকাতা ও মাদ্রাজে আলাদা-আলাদাভাবে দুটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার প্রদর্শনীটি হয়েছিল ওল্ড কোর্ট হাউসে, প্রতি টিকিটের দাম ছিল এক স্বর্ণমোহর। ইতিহাস সেই কথাই বলছে। কলকাতা ও মাদ্রাজের প্রবাসী ইংরেজ সৈনিক ও করণিকরা অনেকদিন আগেই কার্টিয়াস ও মাদাম তুসোর হাতে গড়া মূর্তি দেখেছিলেন!

১৭৬৭ সাল। মা'র হাত ধরে ছোট্ট মেরি বার্নে শহর ছেড়ে পা বাড়াল কার্টিয়াসের নতুন বাড়ির দিকে। নতুন এক শহরের দিকে। শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এক নগরী। তার নাম প্যারিস।

প্যারিস : মেরি থেকে মাদাম তুসো

১৭৬৭ সালে প্যারিস শহর কয়েকটি ছোটখাটো অঞ্চলে বিভক্ত। নোংরা ও সরু রাস্তা। দরিদ্র লোকজন কোনওমতে মাথা গুঁজে ছাউনিতে বাস করে, পায়ে হাঁটে। মাঝে-মাঝে বাহকের দল সেডান চেয়ার কাঁধে ছুটে যায়। এইরকম চেয়ারে বসে বা জুড়িগাড়িতে অভিজাতরা যাতায়াত করেন। শহরে তিরিশ হাজার কলের জল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। জীবাণু সেখানে কিলবিল করছে।

কার্টিয়াস এখন প্যারিসের প্রভাবশালী অভিজাতদের মধ্যে একজন, রুশো, ভলটেয়ার প্রমুখ তাঁর বাড়িতে ডিনার খেতে আসেন।

এই প্যারিসেই মেরির প্রথম মূর্তি গড়ায় হাতেখড়ি। এই ছোট্ট মেয়েটিকে কার্টিয়াস নিজের মেয়ের মতো ভালবাসেন, তিনিই প্রথম একে মোম দিয়ে মূর্তি গড়ার রহস্য শিখিয়ে দিলেন। মোম পেলে মেরি এখন আর হাতে কিছু চায় না। সতেরো বছর বয়সে মেরি প্রথম মডেল গড়ল। তার কাকার এক বন্ধুর মূর্তি। সেই বন্ধুর নাম ভলটেয়ার! মেরি গ্রসহলতজের হাতে গড়া সেটাই প্রথম এক জীবিত মানুষের মুখ। মূর্তি গড়ায় মেরির নাম ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৭৮০ সালে ডাক এল খোদ ভার্সাই রাজপ্রাসাদ থেকে।

রাজা ষোড়শ লুইয়ের দুই বোন। ক্লতিলদে ও এলিজাবেথ। ক্লতিলদের সম্প্রতি সার্ডিনিয়ার যুবরাজের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। এলিজাবেথের আর সময় কাটে না।

রাজকন্যাদের গভর্নেস মাদাম ম্যাকাউ ঠিক করেছেন, এলিজাবেথ মূর্তি গড়া শিখবে। রাজা ষোড়শ লুই ও রানি মেরি আঁতোয়ানেত দু'জনেরই আন্তরিক ইচ্ছে, মেরি রাজকন্যাকে এই মূর্তি গড়া শেখাক।

১৭৮০ সালে রাজপ্রাসাদে চলে গেল মেরি। এখন সে রাজকন্যা এলিজাবেথের শিক্ষক ও বন্ধু! রানি আঁতোয়ানেত, রাজা ষোড়শ লুই এখন স্বেচ্ছায় মাঝে-মাঝেই তার মডেল হন। রাজা ও রানি এখন উনিশ বছর বয়সী এই মেয়েটির বন্ধু!

ফোটো : পরমেশ পুরকায়স্থ

ভারতের তিনজন

মাত্র তিনজন! হ্যাঁ, মাদাম তুসোর বিশ্বখ্যাত জাদুঘরে রয়েছেন শুধুমাত্র তিনজন ভারতীয়। মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী। সম্ভবত এই তিনজন ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয়কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বলে মনে করেন না তুসো-জাদুঘরের কর্তৃপক্ষ।

থ্রি পিস স্যুট পরা, খাঁটি অক্সোনিয়ান উচ্চারণে কথা বলা লন্ডনের অভিজাত ব্রিটিশ সমাজ নিশ্চয় চমকে গিয়েছিল গান্ধীজিকে দেখে। শুধুমাত্র হেঁটো ধুতি ও চাদর পরে পরাধীন ভারতের এই 'নেকেড ফকির' দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসে ঢুকে পড়েন বাকিংহাম প্যালেসে। মাদাম তুসোর উত্তরাধিকারী বার্নার্ড তুসোও নিশ্চয় প্রথমে চমকে ওঠেন, তারপর শ্রদ্ধাবনত হয়েছিলেন রাজনীতির এই সন্ন্যাসীর প্রতি।

বার্নার্ড তুসো নিজের হাতে মোমের ছাঁচ তুলে তৈরি করলেন গান্ধীজির মূর্তি। হেঁটো ধুতি ও চাদর গায়ে, লাঠি হাতে, গোল চশমা চোখে চিরপরিচিত সেই বাপুজি! মাদাম তুসোর জাদুঘরে তিনিই প্রথম ভারতীয়। হেঁটো ধুতি পরেই বেকার স্ট্রিটের বিশ্বখ্যাত এই জাদুঘরে তিনি ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দিয়ে গেলেন।

বার্নার্ড তুসোর পর ভাস্কর এ এন হ্যানসন লন্ডন থেকে সোজা উড়ে এসেছিলেন দিল্লিতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। তুসোর জাদুঘরে ইন্দিরাই দ্বিতীয় ভারতীয়।

ইন্দিরার শোচনীয় মৃত্যুর খবরে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সমস্ত পৃথিবী। নির্বাচনে রাজীব গান্ধীর বিপুল জয়ের খবরও পৌঁছে গিয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র। ১৯৮৪'র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই দিল্লিতে উড়ে এলেন তুসো-জাদুঘরের প্রধান ভাস্কর জুডিথ ক্রেইন। রাজীবের সঙ্গে কয়েকবার বসে, চার মাসের মধ্যে মূর্তিটা তৈরি করে ফেললেন জুডিথ। দাঁড়িয়ে আছেন মানুষপ্রমাণ রাজীব, পরনে সেই ধূসর রঙের যোধপুরি স্যুট। রাজীব নিজেই এই পোশাকটি দিয়েছিলেন। মূর্তিটি গড়তে খরচ হয়েছিল এক লক্ষ টাকা।

১৯৮৬-র ২৬ এপ্রিল তুসোর জাদুঘরে এই মূর্তিটির উন্মোচন করেছিলেন ব্রিটেনের তদানীন্তন ভারতীয় হাইকমিশনার পি·সি·আলেকজান্দার। আর হ্যাঁ, এখন অবধি সেটাই শেষ। তুসোর জাদুঘরে এখনও উন্মোচিত হয়নি নতুন কোনও ভারতীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি।

তখনও মেরি জানত না, এই বন্ধুদেরই ডেথ-মাস্ক একদিন তাকে গড়তে হবে। ১৭৮৯ সালে কার্টিয়াস মেরিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। এতদিনে তিনি জ্যাকোবিন দলের সদস্য রবসপিয়ের, দাঁতো, মারাট প্রমুখ অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর এখন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। কার্টিয়াস বুঝতে পারছেন, এই সময়টা ভাল নয়।

১২ জুলাই প্যারিস শহরে আচমকা ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। অর্থমন্ত্রী নেকারকে বরখাস্ত

সোনামুখে সোনা হাসি ঝরলে — স্ন্যাপার

মিষ্টি মিঠু মিষ্টি হাসি দিলে — স্ন্যাপার

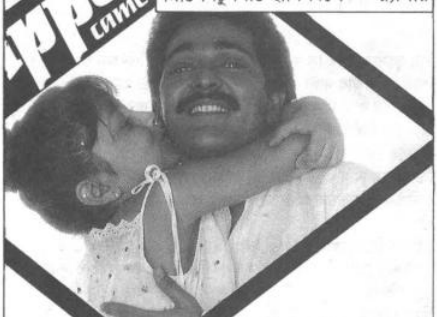

স্ন্যাপার — মধুর কিছু ধরে রাখতে হলে

বিপণনে : আগফা গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ULKA 13145-BEN

মাদাম তুসো : জীবনপঞ্জী

সাল	ঘটনা
১৭৬১	অ্যান মেরি গ্রসহল্‌তজের জন্ম।
১৭৬৭	মাঁর সঙ্গে মেরি প্যারিসে এল।
১৭৮৯	কার্টিয়াস মেরিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন।
১৭৯৩	ষোড়শ লুই ও মেরি আঁতোয়ানেতের মৃত্যু। মেরি করল ওঁদের ডেথ-মাস্ক।
১৭৯৫	ফ্রাঙ্কোইস তুসো ও মেরির বিয়ে। মেরি এখন মাদাম তুসো।
১৮৩৫	বেকার স্ট্রিটে জাদুঘরের উদ্বোধন।
১৮৫০	মাদাম তুসোর মৃত্যু।

একনজরে জাদুঘর

সাল	ঘটনা
১৮৩৫	বেকার স্ট্রিটে জাদুঘরের উদ্বোধন।
১৮৮৪	মেরিলিবোন রোডে উঠে এল জাদুঘর।
১৯২৫	ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জাদুঘর ধ্বংসে।
১৯২৮	নতুন জাদুঘর উদ্বোধন। প্রদর্শনীতে শুরু হল সিনেমার ব্যবহার।
১৯৪০	বোমা পড়ল জাদুঘরে। খুব একটা ক্ষতি হয়নি।
১৯৬৭	'জীবিত নায়ক' প্রদর্শনী শুরু।
১৯৭৫	কাচের ঘরে গাছপালা (কনজারভেটরি) প্রদর্শনী শুরু।
১৯৭৭	কর্নওয়ালে জায়গা কিনে জাদুঘরের 'স্টোর-রুম' তৈরি।

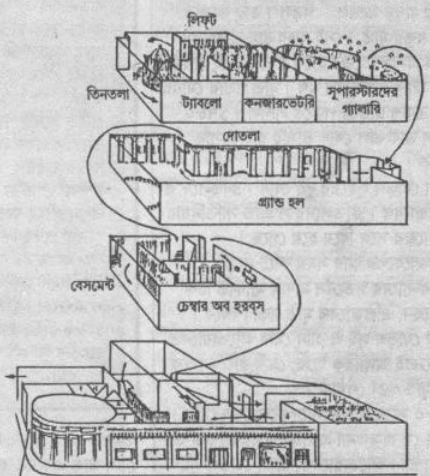

মাদাম তুসোর জাদুঘর ও লন্ডন প্ল্যানেটারিয়াম

করা হয়েছে। হইহই করতে করতে একদল লোক কার্টিয়াসের স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে নেকারের মূর্তির মাথাটা খুলে নিল। সেই মোমের মাথা নিয়ে জনতা যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন রাজার জার্মান রক্ষীরা আচমকা গুলি চালাতে শুরু করল।
হিংস্র, উন্মাদ হয়ে উঠল মানুষজন। দু'দিন পরে ১৪ জুলাই তারা ঘিরে ফেলল কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ। বাস্তিলে তখন মাত্র সাতজন বন্দি, ত্রিশজন প্রহরী। গভর্নর ডি লেনয় কথা দিলেন তিনি গুলি চালাবেন না। তা সত্ত্বেও জনতা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এল বধ্যভূমিতে। গিলোটিনে ডি লেনয়ের মাথা কাটা হল, তারপর কাটা মুণ্ডুটাকে বর্শায় গেঁথে ঝুলিয়ে রাখা হল।
বাস্তিল আক্রমণে কার্টিয়াসও ছিলেন। এবার তিনি মেরিকে নিয়ে গেলেন ওই কাটা মুণ্ডুর কাছে। ছাঁচ বানাতে হবে। মেরি গ্রসহল্‌তজের হাতে তৈরি সেটাই প্রথম ডেথ-মাস্ক।
একের পর এক মৃত্যু দেখতে-দেখতে ক্রমশ পাথর হয়ে যাচ্ছিল মেরি। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল রাজা ষোড়শ লুই, রানি মেরি আঁতোয়ানেত, এলিজাবেথ—প্রত্যেককে! প্রতিটি মৃত্যুর পরেই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেরিকে। ভার্সাই প্রাসাদে যাঁদের সঙ্গে সে আট বছর কাটিয়েছে, সেই ষোড়শ লুই ও মেরি আঁতোয়ানেত! তাঁর ছাত্রী, বান্ধবী এলিজাবেথ! প্রত্যেকের ধড় আর মাথা আলাদা, তখনও ফোঁটা ফোঁটা তাজা উষ্ণ রক্ত গড়িয়ে পড়ছে!
মেরি গ্রসহল্‌তজের হাতে গড়া ছ'টা ডেথ-মাস্ক এখনও রয়েছে তাঁর জাদুঘরে। রাজতন্ত্রের অবসানেও শান্ত হল না ফ্রান্স। বিপ্লবী মারাট স্নানঘরে স্নান করছিলেন, শার্লোট কোর্ডে নামে একটি মেয়ে আচমকা তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। মারাটের মৃতদেহ দেখতে পাঠানো হল মেরিকে। মারাটের মৃত্যু নিয়ে তাঁকে ছবি আঁকতে হবে। শুধু কি মারাট? বিপ্লবের আগে যে রব্‌সপিয়ের বলেছিলেন তিনি দাঁতোর সর্বক্ষণের বন্ধু সেই রব্‌সপিয়েরই দাঁতোকে গিলোটিনে চড়ানোর আদেশ দিলেন।
দাঁতোর ডেথ-মাস্ক গড়েও রেহাই পেল না মেরি। আচমকা তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হল কার্মেলাইট কারাগারে।
দশ দিনের মধ্যে মেরিকে ছাড়িয়ে আনলেন কার্টিয়াস। তারপর শেষ ডেথ-মাস্ক গড়ল মেরি। যে রব্‌সপিয়ের এতদিন সবাইকে গিলোটিনে চড়াতেন, তাঁকেই প্রাণ দিতে হল গিলোটিনে।
রব্‌সপিয়েরের পর মেরি আর কোনওদিন গড়েনি ডেথ-মাস্ক। ১৭৯৪ সালে কার্টিয়াস তাঁর জীবনের যাবতীয় সম্পদ ও সংগ্রহ মেরির হাতে তুলে দিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন। মেরি গ্রসহলতজও এতদিনে ফ্রাঙ্কোইস তুসো নামে এক সিভিল এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। কুমারী মেরি গ্রসহল্‌তজ এখন মাদাম মেরি তুসো!

লন্ডনে এক জাদুঘর

মঁসিয়ে ফাউচ লোকটি অত্যন্ত ক্রূর, ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। দাঁতো রব্‌সপিয়েরের অশান্ত সময়েও কেউ তাঁকে ছুঁতে পারেনি। এখন তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের গুপ্ত পুলিশবাহিনীর প্রধান। একমাত্র ফাউচই যখন-তখন নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। ফ্রান্সে এখন শান্তি ফিরে এসেছে। কেউ আর দাঁতো, রব্‌সপিয়েরের মূর্তি দেখতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। মেরি এতদিনে দুই সন্তানের জননী, নেপোলিয়নেরও তিনি একটি মূর্তি গড়েছেন।
"আপনি কেন লন্ডনে যেতে চান?" চেয়ারে বসতে-বসতে ফাউচ বললেন, "আপনাকে আমরা ছাড়ব না।"
"আমার স্বামী ও ছোট ছেলে এখানেই থাকবেন।" মেরি উত্তর দিয়েছেন, "আমি ও আমার বড় ছেলে লন্ডনে গিয়ে আমাদের মূর্তিগুলির প্রদর্শনী করব।"
"ত্রিশটা!" ফাউচ বলেছেন, "মাত্র ত্রিশটা মূর্তি নিয়ে আপনি যেতে পারেন!"
ত্রিশটা মোমের মূর্তি, ডেথ-মাস্ক নিয়ে জাহাজে উঠে বসেছেন মাদাম তুসো। আর কোনওদিন তিনি ইংলিশ চ্যানেলের এধারে ফিরে আসেননি।
লন্ডন শহরে লাইসিয়াম থিয়েটারের একতলাটা ভাড়া নিয়ে হল প্রথম প্রদর্শনী। লন্ডনে মাদাম তুসোর মোমের পুতুলের এটাই প্রথম প্রদর্শনী। সেটা ১৮০২ সাল।
১৮৩৪ সাল অবধি চরকির মতো ঘুরেছেন মাদাম তুসো। স্কটল্যান্ডের ছোট ছোট গ্রাম, আয়ারল্যান্ড কিছুই বাকি রাখেননি। একটা ঘোড়ার গাড়িতে তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ, শিল্পকীর্তি চাপিয়ে তিনি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বেড়ান। অবশেষে তিনি থিতু হয়ে বসলেন। লন্ডনের বেকার স্ট্রিট ও পোর্টম্যান স্কোয়ারের সংযোগস্থলে বেশ বড়সড় একটি বাজার, সেই বাজারের উলটোদিকে ব্যারাকের মতো একটি মস্ত বাড়ি। এর নাম কিং স্ট্রিট ব্যারাক। রয়াল লাইফ গার্ড রেজিমেন্ট-এর আস্তাবল হিসেবে এই বাড়িটি আগে ব্যবহৃত হত।
বেকার স্ট্রিটের এই বাড়িটিই মাদাম তুসোর প্রথম জাদুঘর।
মাদাম তুসোর নাতি জোসেফ র‍্যান্ডাল ১৮৮৪ সালে এই জাদুঘরকে নিয়ে গেলেন

রয়ালটি অ্যান্ড এম্পায়ার: উইন্ডসর দুর্গের উলটো দিকে মাদাম তুসোর নতুন আকর্ষণ

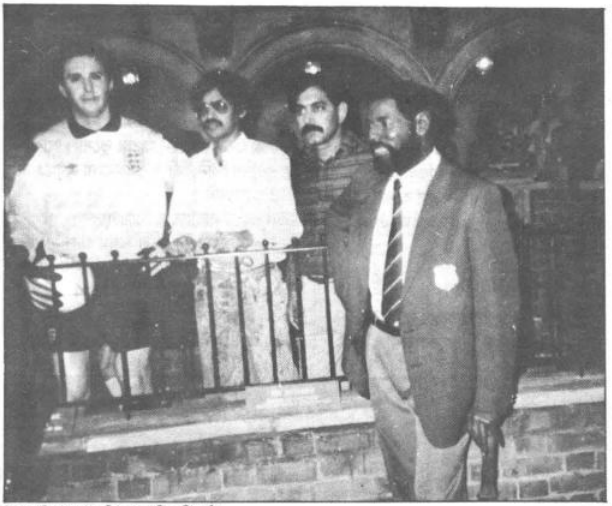

পিটার শিলটন (বাঁ দিকে) ও ভিভ রিচার্ডস

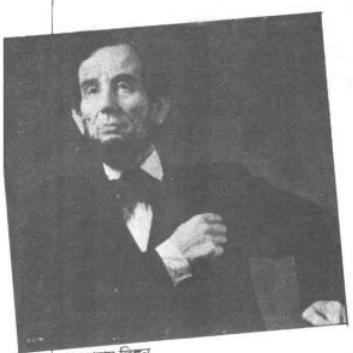

আব্রাহাম লিঙ্কন

মেরিলিবোন রোডে। সেখানে ব্যারন গ্রান্ট একটি বাড়ি করবেন মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু ততদিনে তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন।

কয়েক হাজার পাউন্ড খরচ করে ব্যারন গ্রান্ট শ্বেতপাথরের একটি সিঁড়ি তৈরি করেছিলেন, জোসেফ ১০০০ পাউন্ড দামে সেটি কিনে নিলেন। বাড়ির সিলিং-এ রঙিন প্যানেল তৈরি করে দিলেন মহারানি অ্যানের প্রিয় চিত্রকর সার জেম্‌স থর্নহিল।

মাদাম তুসো মৃত্যুর আগে অবধি তাঁর বংশধরদের একটাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। প্রদর্শনী হবে শিক্ষামূলক, আর তার জন্য কোনওরকম কার্পণ্য করা চলবে না। মাদাম তুসো মানেই যেন হয় জমকালো এক অসাধারণ ব্যাপার। নিতে হবে বিজ্ঞানের অভিনব সব চমকপ্রদ কারিগরি সাহায্য।

১৮৬০ সালেই বেকার স্ট্রিটের জাদুঘরে জ্বলত পাঁচশোটি আলো। তৈরি হয়েছিল 'হল অব কিংস' নামে এক বিশাল ঘর। ২৪৩ ফুট লম্বা, ৪৮ ফুট চওড়া এই ঘরটিই ছিল তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনীকক্ষ। মহারানি ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স আলবার্ট, রাজা তৃতীয় জর্জ ও রানি শার্লোট সবাই এই ঘরে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে

ডালি টমসন

উপস্থিত ছিলেন।

দর্শকরা অবশ্য এই হল অব কিংস নয়, আকৃষ্ট হতেন অন্য একটি ঘরের প্রতি। সেই ঘরের নাম 'ফ্যাশন অব দ্য ডে'। বিভিন্ন দেশের নারী ও পুরুষদের চলতি ফ্যাশন নিয়ে সেই প্রদর্শনীটি করা হয়েছিল।

র‍্যান্ডাল এই প্রদর্শনীকে সরিয়ে এনেছিলেন মেরিলিবোন রোডে। ১৯২৫ সালের ১৮ মার্চ মধ্যরাত্রে এই বাড়িটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুনে গোটা বাড়ির কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয় না। ৪৬৭টি মডেলের মধ্যে ১৭১টি কোনওরকমে বাঁচানো গেল, কিন্তু সেগুলি ততক্ষণে প্রায় আধপোড়া হয়ে ঝলসে গেছে।

মাদাম তুসো তাঁর জীবনে কোনওদিন হার স্বীকার করেননি। চোখের সামনে একের পর এক বন্ধুদের মৃত্যু দেখেছেন, স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছেন অন্য এক নতুন দেশে। তবু হার মানেননি। র‍্যান্ডালের ছেলে জন থিওডোর প্রপিতামহীর ওই গুণটি পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করেছিলেন। তিনিও হার স্বীকার করলেন না। ১৯২৮ সালের মধ্যে তিনি মেরিলিবোন রোডের ওই জায়গাতেই আবার নতুন এক বাড়ি গড়ে তুললেন। সেইসঙ্গে এই নতুন জাদুঘরে রাখা হল সিনেমার ব্যবহার। পরদা জুড়ে বিভিন্ন প্রতিফলনে দেখা যাবে একের পর এক সব অসাধারণ ঘটনা।

মাদাম তুসো একবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মানুষ তাঁর আর কোনও ক্ষতি চান না। ১৯৪০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শেষরাতে লন্ডনের আকাশে হানা দিয়েছিল কয়েকঝাঁক নাৎসি বোমারু বিমান। বোমাবর্ষণে জাদুঘরের সিনেমা-হলটি সেবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লন্ডনে এই বোমা পড়ার পরের দিন সকালেই মাদাম তুসোর জাদুঘরে ছুটে গিয়েছিলেন মহারানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এটাও এক সম্মান।

ভাগ্যের পরিহাসে মাদাম তুসো একদিন প্যারিস ছেড়ে লন্ডনে পাড়ি দিয়েছিলেন। অজানা এক শহরে, অন্য এক দেশে। সেই দেশেরই রানি আজ ছুটে এলেন তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে। ইঙ্গিতে জানালেন, এই জাদুঘর শুধু ব্রিটেনের নয়, পৃথিবীর গর্ব। এমনকী, খোদ রাজপরিবারও এটিকে মনে করেন অমূল্য।

মহারানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ঠিকই করেছিলেন। মাদাম তুসোর সৃষ্টিকে সারা পৃথিবী আজও অবিস্মরণীয় মনে করে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালাপাহাড়

সমরেশ মজুমদার

প্রচণ্ড শব্দ করে জিপটা নড়ে উঠে গড়াতে-গড়াতে থেমে গেল। হরিশ-ড্রাইভার আফসোসের গলায় বলল, "পাংচার হো গিয়া।"

শ্রীকান্ত বকসি জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেপনি ঠিক আছে তো?"

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, "রিপেয়ারমে দিয়া থা, নেহি মিলা আজ।"

শ্রীকান্ত বকসি খিঁচিয়ে উঠলেন, "এত দায়িত্বজ্ঞানহীন কেন তোমরা? স্টেপনি ছাড়া কেউ গাড়ি বের করে?" তারপর অমলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন তো কাণ্ড। এই সময় আমি যদি কোনও ক্রিমিনালকে তাড়া করতাম, তা হলে কীরকম বোকা বলতাম?"

অমলদার দেখাদেখি অর্জুনও জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। জায়গাটা শিলিগুড়ি থেকে বেশি দূরে নয় এবং একেবারে ফাঁকা মাঠের গায়ে তারা দাঁড়িয়ে নেই। কিছু একতলা ঘর-বাড়ি এবং একটি বড় দোকান চোখে পড়ছে। ওই দোকানের পান্তুয়া এ-অঞ্চলে খুব বিখ্যাত। দোকানের সামনে একটি কালো অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। অমলদা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "এখান থেকে তো আর বাসে চড়া যাবে না, আগেরটার যা অবস্থা দেখলাম, আপনাকে দেখে কেউ যদি লিফ্‌ট দেয় তা হলে মুশকিল আসান হতে পারে।"

শ্রীকান্ত বকসি রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটা মারুতি আসছে। দারোগাবাবু হাত দেখালেন। মারুতি থামল। তিনজন বসে আছেন ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে। আরোহীরা জানতে চাইলেন গাড়ি থামাবার কারণ। দারোগাবাবু কারণটা জানালেন। স্পষ্টতই বোঝা গেল একজন মানুষের জায়গা ওই গাড়িতে হতে পারে। অমলদা দারোগাবাবুকে বললেন আগে চলে যেতে। শিলিগুড়ির থানায় কথা বলে তিনি যেন সোজা হোটেলে চলে যান। শ্রীকান্ত বকসির তেমন ইচ্ছে ছিল না কিন্তু অমলদা দ্বিতীয়বার বলার পরে আর আপত্তি করলেন না। মারুতি বেরিয়ে গেলে অমলদা বললেন, "এসো, একটু পান্তুয়া খাওয়া যাক।"

রাস্তায় আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছিল না। ওরা পান্তুয়ার দোকানে ঢুকে দেখল খদ্দের দু'জন। লোক দুটো চা খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে। কাঠের টেবিল-বেঞ্চির ফাঁক গলে অর্জুন বসতেই শুনল অমলদা চারটে করে পান্তুয়া দিতে বললেন। ইদানীং অমলদা চায়ে পর্যন্ত নামমাত্র চিনি খান। চারটে পান্তুয়া অর্জুনের পক্ষেই বেশ বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু সে কিছু বলল না।

দুটো বড় প্লেটে পান্তুয়া এলে জিভে জল এল অর্জুনের। যেমন

আকার তেমন লোভনীয় চেহারা। অমলদা প্রথমটা শেষ করে হঠাৎ দু' হাত দূরে বসা লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তো শিলিগুড়িতে যাচ্ছেন, তাই না ?"

লোক দুটো কথা থামিয়ে এদিকে তাকাল। যার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে সে জিজ্ঞেস করল, "কী করে বুঝলেন ?" লোকটার ঠোঁটে তখন সিগারেট চাপা রয়েছে।

"গাড়িটা তো আপনাদের ?"

ফ্রেঞ্চকাট বাইরে দাঁড় করানো গাড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"ওটা শিলিগুড়ির দিকে মুখ করে আছে, শিলিগুড়ি থেকে এলে উলটোমুখো থাকত।"

ফ্রেঞ্চকাট হাসল, "বাঃ, আপনার নজর তো খুব। হ্যাঁ, শিলিগুড়িতেই যাচ্ছি। কিন্তু কেন ?"

অমলদা বললেন, "এখান থেকে বাসে ওঠা যায় না, একটু লিফ্‌ট চাইছি।"

এবার দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করল, "ওই পুলিশের জিপটাতে আপনারা ছিলেন না ?"

হ্যাঁ। লিফ্‌ট নিচ্ছিলাম, খারাপ হয়ে গেল।"

"আপনারা পুলিশ ?"

"না, না। বললাম না, লিফ্‌ট নিচ্ছিলাম।"

ফ্রেঞ্চকাট কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি বলল, "ঠিক আছে, হিল ভিউ হোটেলের সামনে নামিয়ে দেব।"

"বাঃ, তাতেই হবে।"

কথাবার্তা শুনতে-শুনতে অর্জুনের পান্তুয়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অমলদা দ্বিতীয়টিতে আর চামচ বসাননি। অর্জুনের প্লেট খালি দেখে ইশারা করলেন বাকি তিনটে সে খেতে পারে। অর্জুন মাথা নাড়ল, "অসম্ভব। আমার পেট ভর্তি হয়ে গিয়েছে।"

অমলদা উঠে দাঁড়ালেন। আটটা পান্তুয়ার দাম মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অর্জুনও চলে এল তাঁর সঙ্গে। লোক দুটোর যেন চা খাওয়া শেষ হচ্ছিল না।

হঠাৎ অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন, তোমার কী মনে হয়, হরিপদবাবু কেন খুন হলেন ?"

"যে লোকটা শাসিয়েছিল সে-ই খুন করেছে।"

"কিন্তু কেন ?"

"ওই সম্পত্তির লোভে।"

"কিন্তু তুমি যাকে সম্পত্তি বলছ তা কোথায় আছে কেউ জানে না। হরিপদবাবুকে খুন করে খুনি এখনই লাভবান হচ্ছে না। তাই না ?"

"হয়তো হরিপদবাবু কিছু জানতেন,যা জানলে খুনি কালাপাহাড়ের সম্পত্তি খুঁজে পেতে পারে। কিংবা ওঁরা দুজনেই একটা সূত্র জানতেন। খুনি হরিপদবাবুকে সরিয়ে দিয়ে নিজের খোঁজার পথ নিষ্কণ্টক করল।"

"তা হলে আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসে হরিপদবাবু সূত্রটা বললেন না কেন ? আমাদের ওপর তিনি আস্থা রাখতেই চেয়েছিলেন।"

"হয়তো প্রথম আলাপেই বলতে চাননি। এমন হতে পারে আজ এলে বলতেন।"

"উঁহু। এত হয়তোর ওপর নির্ভর করা চলে না। তা হলে খোঁজার পথটা গোলকধাঁধা হয়ে যাবে। আরও স্পেসিফিক কিছু বলো।"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, "এখনই কিছু মাথায় আসছে না।"

অমলদা গাড়িটার সামনে এগিয়ে গেলেন। গাড়ির ডিকির ওপর কাঁচা হাতে কেউ এস.আই-এল লিখেছে। হয়তো কোথাও পার্ক করা ছিল, কোনও বাচ্চা ছেলে আঙুলের ডগায় অক্ষর তিনটে লিখেছিল। এখন তার ওপর আরও ধুলো পড়ায় বেশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। অমলদা বললেন, "গাড়িটা গতকাল শিলিগুড়িতে ছিল। আজ যদি জলপাইগুড়ি থেকে আসে তা হলে বুঝতে হবে ভোরেই শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়েছিল।"

অর্জুন বুঝতে পারছিল না অমলদা হঠাৎ এই গাড়ি নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে উঠলেন কেন ! তার মনে হল আজকাল অমলদা অকারণে সব ব্যাপার মাথায় নেন।

এই সময় লোক দুটো বেরিয়ে এল। চারপাশে তাকিয়ে দেখে দ্বিতীয়জন স্টিয়ারিং-এ বসল। পেছনের দরজা খুলে দিয়ে ফ্রেঞ্চকাট সামনের আসনে গিয়ে কাচ নামাতে লাগল। অমলদার পাশাপাশি পেছনের সিটে বসে অর্জুন দেখল দ্বিতীয় লোকটির বাঁ কান একটু ছোট। লতি প্রায় নেই বললেই চলে।

গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আপনারা শিলিগুড়িতে কাজে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।" অমলদা স্বাভাবিক গলায় বললেন, "ব্যবসার কাজে।"

"কিসের ব্যবসা ?"

"বিনা মূলধনে যা করা যায় !"

"স্ট্রেঞ্জ ! মূলধন ছাড়া ব্যবসা করছেন ? উকিল-ডাক্তারদেরও তো এক সময় কয়েক বছর খরচা করতে হয় ডিগ্রি পেতে। জলপাইগুড়িতেই থাকেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কয়েক পুরুষ।"

এবার ফ্রেঞ্চকাট বলল, "কলকাতায় বাস করে জানতামই না যে, জলপাইগুড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশি। আমার তো বেশ ভাল লাগছে।" কথাগুলো বলেই সিগারেট ধরাল।

দ্বিতীয় লোকটি হাসল, "শিলিগুড়ির নেই ভাবছেন ? এই যে শিলিগুড়ি, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম ? শিলিগুড়ি নামটা কী করে হল ? লেপচাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াই। সেই ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে লেপচারা পাহাড় থেকে নেমে সমতলে

শিবির গেড়েছিল। পরাজিত হয়েও ব্রিটিশরা আবার সৈন্য জোগাড় করে যখন ফিরে আসছে তখন একজন লেপচা সেনাপতি চিৎকার করে আদেশ দিলেন, 'শ্যালিগ্রি'। শ্যালিগ্রি লেপচা শব্দ। মানে ধনুকে ছিলা পরাও। এই শ্যালিগ্রি থেকে শ্যালগিরি এবং শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ি।"

অর্জুনের মজা লাগছিল। জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির লোকেরা পরস্পরকে সব সময় একটু নীচে রাখতে ভালবাসে। এ-ব্যাপারে বেশ রেষারেষি আছে অনেকদিন ধরেই। জলপাইগুড়ির লোকের চেষ্টায় শিলিগুড়ির মুখে বিশাল রেল স্টেশন তৈরি হলেও তাই নাম রাখতে হল নিউ জলপাইগুড়ি। এই দ্বিতীয় লোকটি নিশ্চয়ই শিলিগুড়ির অনেকদিনের বাসিন্দা। ফ্রেঞ্চকাট তো নিজেকে কলকাতার লোক বললই। কয়েক মিনিটেই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। হিল ভিউ হোটেলের সামনে গাড়িটা থামলে অমলদা নেমে পড়ে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ড্রাইভার ভদ্রলোককে। তিনি মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

একটা রিকশা নেওয়া হল। শিলিগুড়িকে রিকশার শহর বললে ভুল বলা হবে না। প্রায় গায়ে-গায়ে অতি দ্রুত গতি নিয়ে রিকশাগুলো যেভাবে ছুটোছুটি করে তাতে হৃৎপিণ্ড ধড়াস-ধড়াস করে। মহানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে অমলদার পাশে বসে অর্জুন হোটেলের দিকে চলেছিল। অমলদা বসে আছেন গম্ভীর মুখে। বাঁ দিকে নতুন তৈরি বাস টার্মিনাস এখন ফাঁকাই বলা যায়। আর-একটু গেলেই সিনক্লেয়ার হোটেল, তারপরেই দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা। অর্জুনদের অত দূরে যেতে হল না। ডান দিকের একটি সাধারণ হোটেলের সামনে অমলদা রিকশা থামালেন। হোটেলটির দরজায় দুটো সেপাই দাঁড়িয়ে আছে লাঠি হাতে। ভাড়া মিটিয়ে রিকশা ছেড়ে দিয়ে অমলদা এগিয়ে যেতেই অর্জুন অনুসরণ করল।

হোটেলে ঢোকার মুখে সেপাইরা বাধা দিল। একজন বলল, "হোটেল বন্ধ আছে।"

"আমরা জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। শিলিগুড়ির ও·সি· সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।"

"তা হলে থানায় যান। আমাদের ওপর অর্ডার আছে কাউকে ঢুকতে না দেওয়ার।"

"ম্যানেজারবাবু আছেন?"

"না। ওঁকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

অমলদা অর্জুনের দিকে তাকালেন, "এখানেও একই সমস্যা। বিশল্যকরণীর জন্য গোটা গন্ধমাদন পর্বত তোলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। শ্রীকান্ত বকসি এসে পড়েছেন।"

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শ্রীকান্ত বকসি একটা পুলিশের জিপ থেকে নামছেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন অফিসার নেমে এলেন। লোকটি রোগাটে, চোয়াল বসা, মাথার চুল অল্প, পঞ্চাশের ওপর বয়স। ইনিই সম্ভবত শিলিগুড়ির ও·সি·। এমন চেহারার মানুষ খুব সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হন।

"আপনারা কিসে এলেন?" শ্রীকান্ত বকসি জিজ্ঞেস করলেন।

"দুই ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে পৌঁছে দিলেন।" অমলদা জবাব দিলেন।

"আপনিই বোধ হয় এখানকার ও· সি· ? আমার নাম অমল সোম, এই ছেলেটির নাম অর্জুন।"

শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আপনি আমাদের তলব করেছেন। নিশ্চয়ই কথা বলব, কিন্তু তার আগে আমরা কি সেই ঘরটিতে যেতে পারি যেখানে হরিপদবাবু খুন হয়েছেন?"

শিলিগুড়ির দারোগা বললেন, "কেন যেতে চাইছেন ওখানে?"

"হরিপদবাবু আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন।"

"হুম। শ্রীকান্ত, তুমি কী বলো?" শিলিগুড়ির ও·সি· মুখ ফেরালেন।

শ্রীকান্ত বকসি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "মিস্টার সোম সাহায্য করলে এই কেস দু' দিনেই সলভড হয়ে যাবে রায়দা। তা ছাড়া উনি যা বলছেন তা করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে।"

"যুক্তিসঙ্গত মানে? উনি গোয়েন্দা হতে পারেন কিন্তু এই কেসে উনি একজন····মানে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ! চলুন ওপরে। তবে আমিও সঙ্গে থাকব।" শিলিগুড়ির ও· সি·, যাঁর পদবি রায়, হাত নেড়ে সেপাইদের সরে যেতে বললেন। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

গল্প

বিলুপ্ত প্রজাতি

রতন ভট্টাচার্য

হাওড়া থেকে বাসে চেপে কীভাবে কালীঘাটে এসে নেমেছিলুম আমি জানি না। কিন্তু নেমেছিলুম যে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কালীমন্দিরের গায়ে আমার মেজদির শ্বশুরবাড়ি। তাই কালীঘাটে নেমে আমি প্রাণপণে কালীমন্দিরটাকে খুঁজছিলুম। কাল মেজদির বউভাত গেছে। আমরা গাড়ি চেপে বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে গেছি। ভীষণ মজা হয়েছিল। আমি ইচ্ছে করলে কাল অনেকবার সালকে আর কালীঘাটের মধ্যে যাতায়াত করতে পারতুম। তিনটে মোটর গাড়ি কাল কতবার যে একবার মেজদির শ্বশুরবাড়ি একবার আমাদের বাড়ি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমি অবশ্য মা, দিদিদের সঙ্গে এসে খেয়েদেয়ে চলে গিয়েছিলুম। সেজেগুজে চেয়ারে বসে থাকা মেজদিকে দেখে আমার তাক লেগে গিয়েছিল। সবাই ভেবেছিল মেজদিকে দেখে আমি হয়তো কেঁদে ফেলব। কিন্তু আমি কাঁদিনি। মেজদিকে মেয়েরা ঘিরে রেখেছিল। তারই মধ্যে চেয়ারে বসে মেজদি হাত নেড়ে আমাকে ডেকেছিল। ছোড়দি বলেছিল, "এই ভাই, মেজদি তোকে ডাকছে। যা, যা।"

মেজদির কাছে জোর করে নিয়ে যাবে বলে মা আমায় হাত ধরে টেনেছিলেন। আমি যাইনি। আমি গোঁজ হয়ে মেজদির দিকে তাকিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কেউ নিয়ে যেতে পারেনি আমাকে। তারপর খেয়েদেয়ে মোটরে চেপে বাড়ি। কাল রাত্তিরে কিছু বোঝা যায়নি। ক্লান্ত ছিলুম। গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। গাড়ি থেকে নেমে কীভাবে বিছানায় এসেছিলুম জানি না। পায়ের জুতো কে খুলেছিল জানি না। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতে কান্না পেয়ে গেল। কী যে হল! বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। আমি দেখেছি ঘুম ভাঙার পরেই আমার কান্না পায়। আজ না হয় ভীষণ একটা কারণ আছে। আমি যাকে সবচেয়ে ভালবাসি সেই মেজদি আর এ-বাড়িতে নেই। কিন্তু কোনও কারণ না থাকলেও ঘুম ভাঙার পর আমার প্রায়ই কান্না পায়। একদিন দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে উঠে দেখেছিলুম সমস্ত আকাশ মেঘে কালো হয়ে গেছে। তাই দেখে সে কী কান্না আমার! মা, দিদিরা কেউ থামাতে পারে না। পাগলের মতো কেন যে কাঁদছি তা ওরাও জানে না, আমিও না। অবশ্য আজকের ব্যাপারটা

আলাদা। আজ কেন কাঁদছি তা আমি জানি। ভাল করেই জানি। কাল রাত্তিরে চেয়ারে বসে থাকা মেজদির সেই অজানা রহস্যময় মূর্তির কথা মনে করে আমি কাঁদছি। সকালে ঘুম ভাঙার পর যেন আবছা-আবছা বুঝতে পারছিলুম—এ-জীবনে আর কোনওদিন আগের মতো করে আমি মেজদিকে পাব না। এইসব কান্নাকাটির ফলে সেই সকালবেলাই বুকের মধ্যে কীরকম ছন্নছাড়া ভাব হয়েছিল। গোপনে ঠিক করে ফেলেছিলুম আজ আমি একা-একা মেজদির বাড়ি যাব। তাই এখন আমি কালীঘাটে।

এ-জায়গাটা যে কালীঘাট এবং মেজদির বাড়ির আশেপাশেই, এ-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। শুধু মন্দিরটাকে খুঁজে বের করা দরকার। মন্দিরের গায়ে মেজদির বাড়ি। মন্দির পেলে মেজদির বাড়ি পেতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু মুশকিল হল মন্দিরটাকেই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। চারদিকের দোকান, লোকজন আর সন্ধেবেলার আলোর মধ্যে মন্দিরটা যেন কীভাবে লুকিয়ে পড়েছিল। দুপুরবেলা সালকে থেকে বেরিয়ে কালীঘাট পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাওয়াটাও যেন কীরকম রহস্যময়। কালকে মোটরে লেগেছিল মোটে আধ ঘণ্টা। আমি অবশ্য সময়টময় নিয়ে নিজে কিছু ভাবিনি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে শুধু গাড়ি আর লোকজন দেখেছিলুম। বাবা গাড়ি থেকে নামতে-নামতে মাকে হাতের ঘড়ি দেখিয়ে বলেছিলেন, "আমার কথাই ঠিক। দ্যাখো, আধ ঘণ্টা লাগল।"

বাবার কথাটা আমার মনে আছে। তাই বললুম আধ ঘণ্টা। যাই হোক, আধ ঘণ্টা না হয়, এক ঘণ্টা হবে। কিন্তু এতক্ষণ লাগবে কেন? অবশ্য ঠিক কখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আমার জানা নেই। আজ স্কুলে যাইনি। কেউ বলেওনি যেতে। মা আমাকে পাশে নিয়ে শুয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সবাই ঘুমোচ্ছিল। ঠাকুর, কাজের লোক, সবাই। আমি চেয়ারে উঠে বাবার চেম্বারের দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে পড়েছি। দরজার কাছে চেয়ার টেনে আনতে একটু শব্দ হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কারও ঘুম ভাঙেনি। মায়ের পাশে খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরে শুয়ে ছিলুম। উঠে নেমে আসবার সময় কালকে বউভাতে পরে যাওয়া জামাটা আলনা থেকে নিয়ে নিয়েছি। এই জামাটাই যে নিলুম তার কারণ আছে। জামাটার বুক পকেটে পাঁচ টাকার একটা নোট ছিল। মা রেখেছিলেন। কাল যখন গাড়ি চেপে মেজদির বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে আসছি তখন মা টাকাটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "তোর পকেটে রাখলুম। হারিয়ে ফেলিসনি যেন।"

আমি তাড়াতাড়ি বুকপকেটটা হাত দিয়ে চেপে ধরতে মা হেসে ফেলেছিলেন। "অত চাপাচাপি করতে হবে না তোকে। ও ঠিক থাকবে।"

মা যে কেন টাকাটা আমার পকেটে রাখলেন, কিসের টাকা, কোথায় পেলেন, এসব কথা আমার মনে নেই। শুধু সকালে উঠে যখন কাঁদছিলুম তখন মনে পড়েছিল মা তো টাকাটা পকেট থেকে নেননি। এই টাকার ভরসাতেই তখন ঠিক করেছিলুম মেজদির বাড়ি যাব।

এখন অবশ্য একটা পয়সাও আর আমার পকেটে নেই। সালকে থেকে আমি ট্রামে হাওড়া এসেছিলুম। তাতে লেগেছিল দু' পয়সা। দুপুর বলে দু' পয়সা। না হলে অন্য সময় তিন পয়সা লাগে। হাওড়া থেকে বাস নিয়েছিল দু' আনা। এখানে আসতে আমার মোট এগারো পয়সা খরচ হয়েছে। বাকি সব পয়সা, টাকা আমি প্যান্টের পকেটে রেখেছিলুম। এখানে নেমে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলুম পকেট ফাঁকা। এক পয়সাও নেই।

আমি জানি এই ব্যাপারটাকেই বড়রা বলে পকেটমার হওয়া। পকেটে হাত দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলুম আমার পকেটমার হয়েছে। আমার কিছু করার ছিল না। যেখানে বড়রাই কিছু করতে পারে না সেখানে আমি কী করব? আমি তো সবে এ-বছর মনোহর উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের সিক্সে উঠেছি। তবে একটা জিনিস আমি ঝট করে বুঝে গিয়েছিলুম যে, মেজদির বাড়ি খুঁজে না পেলে আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে পারব না। পয়সা না দিতে পারলে বাস কিংবা ট্রাম কেউ নিয়ে যাবে না আমায়। কান ধরে নামিয়ে দেবে। কাজেই মেজদির বাড়ি আজ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। অথচ মুশকিল হল সেটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেজদির বাড়ি দূরের কথা, মন্দিরটাকেই পাচ্ছিলুম না। কালকের অত লোকজন, আলো, বাড়ির সামনে দাঁড় করানো মোটর গাড়ির সারি,

সানাই, সব যেন ভোজবাজির মতো উবে গেছে। যেন কাল রাত্তিরে সেই বাড়িটা শুধু আমাদের জন্য গজিয়েছিল। তারপর আর নেই।

তাই বলে আমি যে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম তা কিন্তু না। ভয়ের লেশমাত্র ছিল না আমার মনে। আমি নিশ্চিন্তে রাস্তার আলো, লোকজন, গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে এ-রাস্তা সে-রাস্তা, এ-গলি সে-গলি করে বেড়াচ্ছিলুম। কেউ যদি বাড়ি ফিরে যেতে না পারে তা হলে যে কী হয় সে-ধারণা আমার একদম ছিল না। বরং তন্ময় হয়ে মেজদির বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে আমি ভাবছিলুম আমার এই কালীঘাট আসাটাকে কি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া বলা চলবে ? একবার মনে হচ্ছিল আমি কাউকে না জানিয়ে গোপনে চলে এসেছি, অতএব এটা বাড়ি থেকে পালানো। পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল মেজদির বাড়ি খুঁজতে এসেছি, এটা কেন বাড়ি থেকে পালানো হবে ? চিন্তাটা প্রায় কুয়াশার মতো সর্বক্ষণ আমার মাথার ভেতরটাকে ভরে রেখেছিল।

বাড়ি থেকে পালানোর কথা যখন এসে পড়ল তখন ব্যাপারটা একটু খুলে বলতে হয়। আমি এর আগে বারতিনেক পালিয়েছি। প্রথমবার আমরা তিন বন্ধু জি টি রোড ধরে হেঁটে-হেঁটে পালাবার চেষ্টা করেছিলুম। তখন আমি সবে ফোর থেকে ফাইভে উঠেছি। আমার বন্ধুরা সঙ্গে এক পয়সাও নেয়নি। আমি নিয়েছিলুম চোদ্দ আনা। মায়ের আলমারি খুঁজে পেয়েছিলুম। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এ-সম্পর্কে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সে-সময় মাথার মধ্যে যেন একটা পালিয়ে-চলা-ভাব সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে ফিরত। সেই তাড়নাতেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। সালকে থেকে মাহেশ পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলুম আমরা। সেই প্রথম আমার মাহেশের রথ দেখা। রথের সময় নয়। রাস্তার ধারে বিশাল রথটা দরমার বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। এই মাহেশের রথের কাছে এসে আমাদের দলে ভাঙন ধরল। আমার দু' বন্ধুর হঠাৎ মায়ের জন্য ভীষণ মন কেমন করতে লাগল। তাদের মুখের ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল তারা এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। অগত্যা ফেরা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। চোদ্দ আনা পয়সার দশ আনাই দফায়-দফায় খেয়ে শেষ করে ফেলেছি। পকেটে আছে মোটে চার আনা। বালি পর্যন্ত হেঁটে আসতে আটটা বেজে গেল। তখন আমার দু' বন্ধু কাঁদো-কাঁদো মুখে সেই চার আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে বাসে উঠে পড়ল। বলল, "তুই হেঁটে আয়। চার আনায় তো তিনজনের হবে না। আর হাঁটতে পারছি না রে। আমরা বাসে যাই।" আমি রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরেছিলুম। ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত। বোধ হয় আমার চেহারা দেখেই সেবার আমাকে মারা হয়নি। তা ছাড়া, সেটা ছিল প্রথমবার। দ্বিতীয়বার কিন্তু আমার কোমর থেকে বেল্ট খুলে নিয়ে বাবা মেরেছিলেন আমায়। দ্বিতীয়বার আমার পালানোর কোনও সঙ্গী ছিল না। আমাকে স্কুলের মাইনে দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার বইপত্তর ঘরের নর্দমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই মাইনের আড়াই টাকা নিয়ে পালিয়েছিলুম। ঠিক ছিল যাব রংপুর, ঠাকুরমার কাছে। শিয়ালদা স্টেশনে একটা লোক টিকিট কেটে দেবে বলে আমার দু' টাকা ঠকিয়ে নেয়। আমি তখন বিনা টিকিটেই সামনে যে ট্রেন পাই তাতেই উঠে বসি এবং বর্ধমান পৌঁছে যাই। বর্ধমানে একজন চেকার আমাকে ধরে হাওড়ার গাড়িতে তুলে দেন। তারপর বাবার হাতের সেই বেল্টের মার। তৃতীয়বার অবশ্য কোথাও যাওয়া হয়নি। ট্রামে করে হাওড়া আসছিলুম। পকেটে পয়সা ছিল না। ভেবেছিলুম হাওড়া স্টেশনে ঢুকে যে-কোনও একটা ট্রেনে উঠে বসে থাকব। কিন্তু ব্যাপারটা হতে পারেনি। কন্ডাক্টর এগিয়ে আসতে লাফ দিয়ে ট্রাম থেকে নামতে গেলুম। ইচ্ছে, আবার পরের ট্রামে উঠব। কিন্তু পড়ে গিয়ে মাথাটাথা ফাটিয়ে এমন কেলেঙ্কারি করলুম যে, সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। এই তিনবারের ঘটনাই ঘটেছিল ফাইভে পড়বার সময়। তারপর ফাইভে পরীক্ষা দিয়ে সিক্সে উঠলুম। সিক্সে ওঠার ক'মাস পর মেজদির বিয়ে এবং মেজদির বিয়ের দু' দিন পর আবার আমি বাড়ি থেকে পালিয়েছি। অবশ্য এবার আর রংপুরের বদলে বর্ধমান নয়। এবার কালীঘাট যাব বলে বেরিয়ে কালীঘাটেই এসেছি। কিন্তু না মন্দির, না মেজদির বাড়ি, দুটোর কোনওটাই খুঁজে পাচ্ছি না।

"এই খোকা, তোমাকে বাবু ডাকছেন।"

আমি ভয়ানক চমকে গিয়েছিলুম। মুখ তুলে দেখলুম, পুলিশের মতো জামা আর হাফ-প্যান্ট পরা একটা লম্বা লোক আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের সঙ্গে তার তফাত হল জামাটা প্যান্টের মধ্যে গোঁজা নয়। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "আমাকে বলছেন ? কে ডাকছে আমায় ?"

লোকটা পাশের একটা দোকান ঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "ওই তো বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। উনি ডাকছেন।"

আমি দেখলুম রাস্তা থেকে উঁচু একটা দোকানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভারী সুন্দর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে একটা টাইপ মেশিন। একটা অল্পবয়েসী লোক বসে টাইপ করছে। দূর থেকে দেখে আমার দোকানটাকে ওষুধের দোকান বলে মনে হল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলুম, না, ওষুধের দোকান নয়। ওষুধপত্র নেই। শুধু র‍্যাকভর্তি কাগজপত্র। মাঝখানে টেবিল চেয়ার এবং দু' আলমারি ভর্তি বই। আমি কাছে এগিয়ে গেলে ভদ্রলোক বললেন, "তোমাকে সেই বিকেল থেকে দেখছি এদিকে ঘুরছ। রাত হয়ে গেল। কাকে খুঁজছ তুমি ?"

"মেজদিকে। কালীমন্দিরটা কোথায় বলতে পারেন ? কালীমন্দিরের গায়েই আমার মেজদির বাড়ি।" আমি একটু হাসলুম। "কাল গাড়ি চেপে এসে মেজদির বউভাতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছি, কিন্তু আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না।"

ভদ্রলোক কথা না বলে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের গাড়ি আছে ?"

"না। আমাদের নেই। বাবা কাল বউভাতের জন্য তিনখানা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন। আমার বাবার সাইকেল আছে।"

"কী করেন তোমার বাবা ?"

"ডাক্তার।"

"তুমি বাড়ি থেকে কাউকে না বলে পালিয়ে এসেছ, তাই না ?"

কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। উনি একটু সময় অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তো কালই এসেছিলে বললে। তা হলে আজ আবার আসতে গেলে কেন ?"

আমি মাথা নিচু করে বললুম, "জানি না।"

"তুমি তোমার জামাইবাবুর নাম জানো ?"

"না।"

"জামাইবাবুর বাবার নাম ?"

বললুম, "না, তাও জানি না।"

"ঠিকানা ?"

"না।"

"তুমি তো দেখছি বেশ পাগল আছ, কিছুই না জেনে মেজদিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছ। তোমার বাড়ি কোথায় ?"

"সালকে।"

"বাড়ির ঠিকানা জানো ?"

বললুম, "হ্যাঁ জানি। একশো চব্বিশ নম্বর শ্রীরাম ট্যাং রোড।"

ভদ্রলোক হেঁটে ভেতরে গিয়ে চেয়ারে বসলেন, আমাকে হাত তুলে ডাকলেন, "এই, এখানে এসে বোসো। আমি ভেতরে গিয়ে টেবিলের উলটো দিকের একটা চেয়ারে বসবার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন, "কখন বেরিয়েছ ?"

"দুপুরবেলা।"

"খিদে পায়নি ?" বলে সামান্য হাসলেন উনি। একটু চেঁচিয়ে 'জিতেন, জিতেন' বলে দু'বার ডাকলেন। পুলিশের মতো পোশাক পরা সেই লোকটা রাস্তা থেকে উঠে এলে উনি তাকে দু' আনা পয়সা দিয়ে বললেন, "চট করে গরম কচুরি এনে দে তো। সেই দুপুর থেকে ও কিছু খায়নি।"

দু' আনায় আটখানা গরম কচুরি। সঙ্গে চমৎকার ছোলার ডাল। খেয়ে পেট ভর্তি হয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে চেয়ারে এসে বসবার পর মনে হল ব্যাপারটা হঠাৎ যেন রহস্যময় হয়ে গেছে। উনি আর আমার সঙ্গে কথা বলছেন না। মাথা নামিয়ে খসখস করে একটা কাগজে কী সব লিখছেন। একবার একজন লোক 'উকিলবাবু' বলে ডেকে ওঁকে বাইরে নিয়ে গেল। ফিরে এসেও উনি আবার লিখতে লাগলেন। আমি বুঝলুম উনি একজন উকিল। তখন আমার মাথার মধ্যেও নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। একবার ভাবলুম, তা হলে কি আমি কালীঘাট না এসে অন্য কোথাও চলে এসেছি ? পরক্ষণেই মনে হল, না, তা নয়। সে হলে উনি আমায় বলতেন। একবার মনে হল এইমাত্র যে লোক ওঁকে ডাকল উনি বোধ হয় তাকে মেজদির বাড়ি খোঁজ করতে পাঠালেন।

মনে-মনে আমার যে খুব দুর্ভাবনা ছিল তা না। আমি নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারের একধারে বসে রাস্তার আলো, লোক-চলাচল দেখছিলুম। অনেকক্ষণ পর উনি লেখা থামিয়ে আমায় ডাকলেন, "এই ! তোমার নাম কী ?"

"চুনিলাল বসু।"

উনি জিতেনকে ডাকলেন। জিতেন এলে তার হাতে লেখা কাগজখানা ভাঁজ করে দিয়ে আমাকে বললেন, "তুমি যাও ওর সঙ্গে। ও তোমাকে পৌঁছে দেবে।"

কিছু না জিজ্ঞেস করেই আমি বোকার মতো তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কেন আমি এই লোকটার সঙ্গে যাব ? কিংবা, ও আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ? সেসব কিছু জিজ্ঞেস না করেই আমি বেরিয়ে পড়লুম জিতেনের সঙ্গে। আমার যেন কেন মনে হল জিতেন আমাকে মেজদির বাড়ি পৌঁছে দেবে। কিন্তু যখন ট্রাম-রাস্তায় এসে ট্রামে উঠে বসলুম তখন আমার মাথার মধ্যে সব কীরকম তালগোল পাকিয়ে গেল। ট্রামে কেন ? তবে কি সত্যিই আমি কালীঘাট না গিয়ে অন্য কোথাও পৌঁছে গিয়েছিলুম ? এখন কি তা হলে কালীঘাট চলেছি ? আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ট্রাম থেকে নেমে যখন হেঁটে হাওড়ার পোল পার হচ্ছি তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে, জিতেন আমাকে অন্য কোথাও না, সালকেয় আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে উঠল আমার।

মিনিট কুড়ি লাগল বাড়ি পৌঁছতে। বাবার চেম্বারে তখন বিরাট জটলা। ক্ষেত্র মিত্র লেন থেকে মামারা এসেছেন, দাদু এসেছেন, বড় মামিমা এসেছেন। মা তো আছেনই। আমরা ঢুকতেই বিস্ময়ে সবাই কিরকম নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। বড়মামা একবার শুধু 'এই তো এসে গেছে চুনি' বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিলেন কিন্তু বাবার কঠোর দৃষ্টির সামনে ঢোক গিলে ফেললেন। জিতেন ঘরে ঢুকে কথা বলল না। ভদ্রলোকের দেওয়া কাগজখানা বাড়িয়ে দিল বাবার দিকে। আমি বুঝতে পারলুম ওটা চিঠি। বাবা চিঠিটা একবার মনে-মনে পড়ে ফেললেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে মাকে বললেন, "শোনো তোমার গুণধর ছেলের কথা। আমি পড়ছি। মহাশয়, প্রণাম জানিবেন। আপনার ছেলে চুনিলালকে আমার দরোয়ানের সহিত পাঠাইলাম। দয়া করিয়া দুই লাইন প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবেন। শ্রীমানকে বিকাল হইতে আমার চেম্বারের নিকট ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়। ভদ্রলোকের ছেলে দেখিয়া সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম সে বাড়ি হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাই এবং দেখি আমার অনুমান সত্য। শ্রীমান কালীমন্দিরের পেছনে দাঁড়াইয়া আমার নিকট কালীমন্দিরের খোঁজ করিতেছিল। মন্দিরের গায়েই নাকি···।"

বাবা চিঠি পড়তেই থাকলেন, কিন্তু আমার কানে আর একটা কথাও ঢুকল না। মন্দিরের পেছনে দাঁড়িয়ে কালীমন্দিরের খোঁজ করেছিলুম জেনে আমার বুদ্ধি লোপ পেতে বসল। ভীষণ অবাক হলুম। বুকের ভেতর ঘুলিয়ে উঠল। ইস, মেজদির বাড়ির কাছে গিয়েও বাড়িটাকে খুঁজে বের করতে পারলুম না !

তারপর ষাট বছর পার হয়ে গেছে। সেই আমার শেষ বাড়ি থেকে পালানো। পরে ভাল ছেলের মতো পড়াশোনা করেছি। চাকরিবাকরি করেছি। এখন তো সাত বুড়োর এক বুড়ো। চিরকালের মতো পালিয়ে যাওয়ার ধান্দায় সেজেগুজে বসে আছি। এবারে আর ভুল জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজও চোখ বুজলে স্পষ্ট দেখতে পাই উকিল ভদ্রলোককে। তাঁর চেম্বারে বসে আমার সেই গরম কচুরি খাওয়াকেও। আজকাল কিন্তু একটা কথা আমার খুব মনে হয়, তাঁর মতো মানুষ আর পাওয়া যাবে না। সমস্ত শহর চষে বেড়ালেও না। অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই যাঁর সন্দেহ হবে ছেলেটা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। শেষে ডেকে এনে যত্ন করে কচুরি খাইয়ে দরোয়ান দিয়ে বাড়ি পাঠাবেন। না, এমন লোক আর আজকাল আমাদের শহরে নেই। কল্পনাপ্রবণ ছেলেরা এখনও বাড়ি থেকে পালায়, কিন্তু তাদের ফিরিয়ে আনার সেই লোক আর নেই। শুধু আমাদের শহরে কেন, আমি জানি, এই প্রজাতির মানুষ পৃথিবী থেকেই নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

Amela—4 (31.10.90)

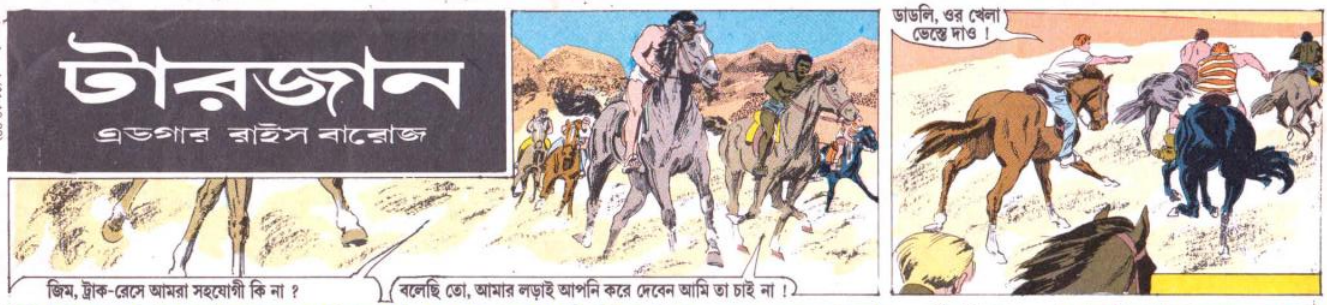

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

প্রকৃতিবিজ্ঞান

জীবনদায়ী গাছের সন্ধানে

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ এ.এ.এস. এম ভেষজ উদ্যান সম্পর্কে জানিয়েছেন নীরদ রায়

তিন-চার ফুটের মতো সরু ও লম্বা পায়ে-হাঁটা রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে পরিকল্পনামাফিক লাগানো হয়েছে নানারকমের গাছপালা। বিচিত্র তাদের চেহারা ও চরিত্র, একজনের সঙ্গে অন্যজনের যেন কোনও মিলই নেই, অথচ এ ওর পাশে হেলান দিয়ে রয়েছে মিলেমিশে। এই অপরূপ সবুজের সমারোহ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের পেছন দিকে, কলেজ বিল্ডিংয়ের একদম গা ছুঁয়ে প্রায় ৪ একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ.এ.এস.এম ভেষজ উদ্যান।

এই ভেষজ উদ্যানের পরিকল্পনা কীভাবে হল তার উত্তরে উদ্যানের অন্যতম পরিচালক ও প্রাণপুরুষ অধ্যাপক ইন্দুলাল সাহা জানালেন, "শুধু পশ্চিম দিনাজপুর জেলাই নয়, গোটা উত্তরবঙ্গে কত দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালি যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন, তার কোনও হিসেব নেই। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মাইলের পর মাইল জঙ্গল আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এইসব বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গাছপালাকে আমাদের বাঁচাতে হবে, একটা নিরাপদ জায়গায় এনে এদের রক্ষা করতে হবে। এইরকম একটি ভাবনা ও বোধ থেকেই এই ভেষজ উদ্যান গড়ে তোলার পরিকল্পনা।"

এই ভেষজ উদ্যানে বর্তমানে সুস্থ ও জীবিত গাছের সংখ্যা প্রায় ৯০০। যদিও লাগানো হয়েছিল ১২০০-র মতো বিভিন্ন ধরনের গাছ। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরের জলবায়ু

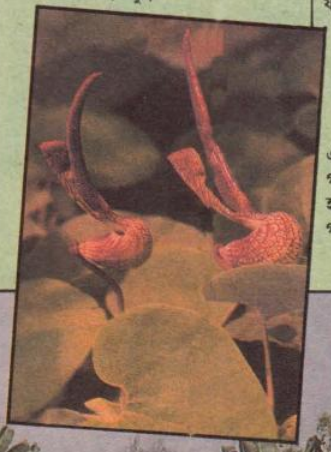

পক্ষীলতা গাছ ও ফুল

ভেষজ উদ্যানে শুধু গাছ আর গাছ

ব্রহ্মযষ্টি গাছের সমাবেশ

আর আবহাওয়া কিছু গাছকে বাঁচতে দেয়নি। এই ৯০০-র মতো বিভিন্ন গাছের মধ্যে ২০০-৩০০ গাছ একেবারে বিরল শ্রেণীর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল, যেমন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, অসম, নাগাল্যান্ড, ডুয়ার্স, নেপাল, হিমালয় পাহাড় এবং আশপাশের জেলা কলকাতা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জায়গা থেকে এইসব গাছপালা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও অনেক উৎসাহী মানুষ, প্রতিষ্ঠান, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টরও বহু দুষ্প্রাপ্য গাছপালা দিয়ে এই উদ্যানের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এক-একটা গাছের নাম এবং তাদের ভেষজ গুণাগুণের সঙ্গে আমাদের একটা ধারাবাহিক পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সেদিন ভেষজ উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন এই উদ্যানের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী সৌরীন নাগ। তিনি এই উদ্যানের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত আছেন। বিভিন্ন সময় বহু দুষ্প্রাপ্য গাছ বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে এখানে লাগিয়েছেন। হাতে-কলমে গাছপালা নিয়ে গবেষণাও করেন। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে সৌরীনবাবু যখন আমাদের এক-একটা গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে বলছিলেন, এই গাছের পাতার রস ৩-৪ দিন খেলে বদহজম সেরে যায়, কিংবা ওই গাছের ছাল হার্টের অসুখে দারুণ কাজ করে, এই গাছের পাতার রস চুলে মাখলে চুল পাকা বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা সত্যিই খুব বিস্ময়

অনেক ক্যাকটাসের একটি

দু-তিনশো গাছ একেবারে বিরল শ্রেণীর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এইসব গাছপালা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল প্রতিটি গাছের কাছে গিয়ে দু-তিন মিনিট করে দাঁড়াই, আর একটা করে ছবি তুলে রাখি। এই ভেষজ উদ্যানে ৩০-৩৫ রকমের ক্যাকটাস, ৮-১০ রকমের বাঁশ রয়েছে। বাঁশের চেহারা এরকম হয় আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না। এদের পাশাপাশি রয়েছে ১৫-২০টা পাম্পপাদপের সারি। রয়েছে অর্জুন, অশোক, ইপিকাক, থুজা, শালপানি, সর্পগন্ধা, হস্তীকর্ণপলাশ, ওলটকম্বল, নিশিন্দা, অশ্বগন্ধা, বেলেডোনা, সিঙ্কোনা, শতমুখ ২-৩ রকমের, অনন্তমূল, বিরল শ্রেণীর কাঠবাদাম, দারুচিনি, গোলমরিচ, তেজপাতা,ব্রাহ্মী, ঘৃতকাঞ্চন, ৫-৬ রকমের বিশল্যকরণী, ৩-৪ রকমের রবারের গাছ, ৩ রকম বাসক মহাভৃঙ্গরাজ, মেহেন্দী, কর্পূর, সাদা মাকাল, জয়ন্তী, এলাচ,বেড়েলা, হাড়জোড়া, কয়েতবল, তমাল, ৫-৬ রকমের ঝাউ, বজ, নাগকেশর, নথি, ভামোট, বনচাঁড়াল, করমচা, বিরল শ্রেণীর ধুতুরা ঈশ্বরমুখ, পক্ষীলতা, চাইনিজ বট, অগ্নীশ্বর, একাঙ্গী, ঘৃতকমারী, নেপালি ধনে, তেঁতাল, লতাকস্তুরী, ছোট চাদরা, লতা কটকি, মনসিজ, বড় বৃহতি ইত্যাদি অজস্র জীবনদায়ী গাছ। পরীক্ষামূলকভাবে এখানে কিছু চা ও কফি গাছের চারাও লাগানো হয়েছে। আছে ৫-৬ রকমের পলাশও।

উদ্যানের ঠিক মাঝখানটায় আছে একটি জলাধার। এখান থেকে পাইপের সাহায্যে বিভিন্ন গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়। এই উদ্যানের গাছগাছালির পরিচর্যা ও দেখাশোনা করার জন্যে রয়েছেন ৪ জন কর্মচারী। ফলে কোন গাছ কোথায় কীভাবে লুকিয়ে আছে, কার কতটুকু আলো ও জল লাগবে এসব ব্যাপার এঁদের নখদর্পণে। যদিও এই উদ্যানের প্রকৃত নাম 'বায়ো-ফিজিকস রিসার্চ সেন্টার', কিন্তু 'এ· এ· এস· এম ভেষজ উদ্যান' নামেই এর পরিচিতি ও নামডাক। রায়গঞ্জ কলেজের চারজন প্রয়াত অধ্যাপক অজিতকুমার দাস, অমিয়কুমার ভট্টাচার্য, শর্মিলা ভট্টাচার্য, মায়াবী ঘোষের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে এই এ· এ· এস· এম। এই চারজন অধ্যাপকই মারা যান দুটি মর্মান্তিক পথ-দুর্ঘটনায়। এঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশে এই ভেষজ উদ্যানের নামকরণ করা হয় এইভাবে। কথাপ্রসঙ্গে ইন্দুবাবু জানালেন, "এই ভেষজ উদ্যানের পরিকল্পনা আগে থেকে হলেও ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে রায়গঞ্জ কলেজ কাউন্সিলের ১০১ -তম সভায়

আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যান গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়। জেলা সমাহর্তা (পশ্চিম দিনাজপুর জেলা), জেলা সভাধিপতি ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ১২ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি পরবর্তীকালে এই উদ্যানের কাজকর্ম দেখাশোনা ও এর উন্নতির জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিতে থাকেন।"

এই ভেষজ উদ্যান এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের, যারা এসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে, তাদের সাহায্য করছে নানাভাবে। স্থানীয় অনেক গরিব ছাত্র-ছাত্রী, যাদের পক্ষে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন যাওয়া সম্ভব হয় না, তাদের কাছে এই ভেষজ উদ্যান যেন অনেকটা হাতের কাছে স্বর্গ। অন্যদিকে এই উদ্যান ফোক মেডিসিন কালচার (গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি)-কে সাহায্য করছে নানাভাবে। শুধু পশ্চিম দিনাজপুর জেলাতেই নয়, সারা উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে এখনও বহু আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আছেন, যাঁরা আজও গাছ গাছালির ছালবাকল পাতার রস দিয়ে অনেক ওষুধ তৈরি করেন, নানা রোগব্যাধিও সারিয়ে ফেলেন এসব ওষুধ দিয়ে। এঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইন্দুবাবু এবং সৌরীনবাবু বলেন, "আজকাল প্রায়ই এই ভেষজ উদ্যানে দূর-দূরান্ত থেকে এইসব চিকিৎসক আসেন, বিভিন্ন গাছের পাতা বা শিকড় তুলে নিয়ে যান। আমরা জিজ্ঞেস করে জেনেছি, ওগুলো দিয়ে তাঁরা নাকি ওষুধ তৈরি করেন এবং অনেক অসুখ নাকি তাতে সেরেও যায়। আমরা এই বিলুপ্তপ্রায় ফোক মেডিসিন কালচারটাকেও বাঁচিয়ে রাখতে চাই। ঐঁদের উৎসাহ দিয়ে থাকি নানাভাবে।"

ইতিমধ্যেই এই ভেষভজ উদ্যানের (গবেষণা-কেন্দ্রটির) নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মালদা, জলপাইগুড়ি ও বিভিন্ন জেলার অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে এই উদ্যানে এসে একাধিকবার দেখে গেছেন। শুধু ছাত্র-ছাত্রীই বা কেন, গাছপালা নিয়ে গবেষণা করেন এমন মানুষও আজকাল প্রায়ই এখানে আসেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও সম্ভবত এত বড় ভেষজ উদ্যান আর নেই। বর্তমানে এই ভেষজ উদ্যানটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, তাই এখন এর আর্থিক অনটন অনেকটাই কমে গেছে। প্রথম দিকে কিন্তু পরিস্থিতি এরকম ছিল না—ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কট ছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নানাভাবে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিলেও ৪ জন কর্মচারীর মাইনে,

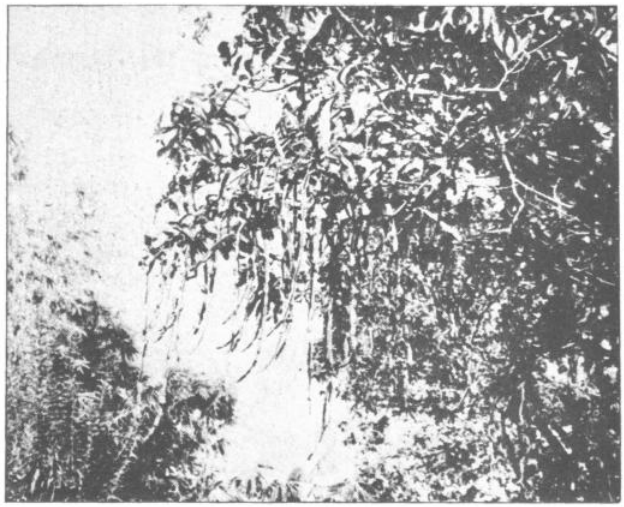

গাছের নাম 'হাড়জোড়া'

নাগকেশর

শুধু ধ্বংসের ইতিহাস নয়, সৃষ্টির ইতিহাস নিয়েও যে গর্ব করার কিছু থাকতে পারে—এই ভেষজ উদ্যান যেন সেটাই আর একবার প্রমাণ করে দিল।

উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা, নতুন নতুন গাছ লাগানোর ধারাবাহিক খরচ—এসব কিছুতেই ঠিকভাবে হচ্ছিল না। ঠিক এই সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৯ সালের গোড়ায় রায়গঞ্জ কলেজ পরিদর্শনে এসে এই ভেষজ উদ্যান দেখে এতই আনন্দ পান যে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন, "আজ থেকে এই ভেষজ উদ্যান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের সম্পত্তি, এর দায়দায়িত্ব এখন থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের।"

এই মহৎ ঘোষণা উদ্যানটিকে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে। '৮৯ সালের জুলাই মাস থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যও আসতে আরম্ভ করে। উদ্যানের লাগোয়া দুটি বিশাল পুকুরকে নিয়ে (প্রায় ৪-৫ একর জায়গা) ভবিষ্যতে একে আরও বড় করে তোলার ব্যাপারে রয়েছে নানা পরিকল্পনা। রায়গঞ্জে নেমে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে এ· এ· এস· এম ভেষজ উদ্যান যাওয়ার রাস্তা। রেলওয়ে স্টেশন থেকে দশ মিনিটের পথ।

শুধু ধ্বংসের ইতিহাস নয়, সৃষ্টির ইতিহাস নিয়েও যে গর্ব করার কিছু থাকতে পারে—এই ভেষজ উদ্যান যেন সেটাই আর-একবার প্রমাণ করে দিল।

ফোটো : অলক কুণ্ডু

টাকাকড়ি

মৌর্যোত্তর যুগ: দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা (২)

উত্তর ভারতের মতোই দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় মৌর্যোত্তর যুগ ছিল ঘটনাবহুল। লিখেছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত স্বর্ণ মুদ্রার রেখাচিত্র

ভদ্রদের মুদ্রার আরও নিদর্শন মিলেছে মধ্যপ্রদেশের এরান—বিদিশা ভূখণ্ডে। দমভদ্রের মুদ্রায় তার নাম ও অন্যান্য চিহ্নের ছাপ দেওয়া হয়েছিল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছাঁচে আঘাত করে মুদ্রা প্রস্তুতির প্রণালী অনুযায়ী। ওই জাতীয় আরও মুদ্রা জানা আছে। কিন্তু দমভদ্র বা অন্যদের সঙ্গে গোভদ্রর কোনও বংশগত যোগ ছিল কি না জানা নেই।

বিদর্ভ অঞ্চলে ভূমিমিত্র, কন্‌হমিত্র বা কৃষ্ণমিত্র ও সূর্যমিত্রর তামা ও ব্রোঞ্জের যে মুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সূর্যমিত্রর একটি ব্রোঞ্জ মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে সূর্যমিত্রর নাম ও শিব, গাছ ইত্যাদির ছবি এবং অন্যদিকে চক্র, বলদ প্রভৃতির ছবি সমেত মুদ্রাটির দু' দিকেই প্রতিছাপ লক্ষ করা যায়। মুখ্য দিকের প্রতিছাপে সর সতকনিস লেখ এবং হাতি ও ক্রুসের চার প্রান্তে বৃত্ত সমেত একটি প্রতীক (যা উজ্জয়িনী প্রতীক নামে খ্যাত)। অন্যদিকে বলদের ছবির প্রতিছাপ। বোঝা যাচ্ছে যে, সূর্যমিত্রর রাজ্য দখল করে শ্রী সাতকর্নি নামে এক রাজা প্রতিপক্ষের মুদ্রার ওপরে নিজের মুদ্রার ছবির ছাপ দিয়ে পুনরায় বাজারে চালু করিয়েছিলেন। বিজয়ী রাজাদের এই ধরনের ব্যবহারের আরও দৃষ্টান্ত জানা আছে।

আলোচ্য বিজয়ী রাজা যদি দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের সাতকর্নি নামের কয়েকজন জ্ঞাত নৃপতিদের মধ্যে একজন হয়ে থাকেন তবে মিত্রদের রাজ্য সাতবাহন বংশের অধীনে এসেছিল বলে মনে করা যায়। সেক্ষেত্রে বিদর্ভের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সাতবাহন শাসনের আগেই বেশ কিছু কাল লেখসমেত মুদ্রার চল ছিল মনে করতে হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার বীরপুরমে এবং প্রধানত কর্নাটকের চিত্রদুর্গ জেলা অঞ্চলে প্রাপ্ত 'মহারঠি' উপাধির দুই শাসক গোষ্ঠীর যেসব মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি মৌর্যোত্তর যুগের না সাতবাহনদের শাসনকালের খানিকটা সমসাময়িক, সে-বিষয়ে বিতর্ক আছে।

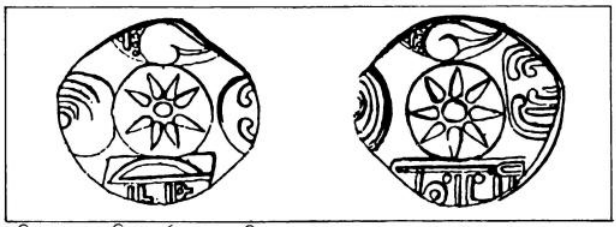

বিদর্ভ অঞ্চলে ভূমিমিত্র, কন্‌হমিত্র বা কৃষ্ণমিত্র ও সূর্যমিত্রর তামা ও ব্রোঞ্জের যে মুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সূর্যমিত্রর একটি ব্রোঞ্জ মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে সূর্যমিত্রর নাম ও শিব, গাছ ইত্যাদির ছবি এবং অন্যদিকে চক্র, বলদ প্রভৃতির ছবি সমেত মুদ্রাটির দু' দিকেই প্রতিছাপ লক্ষ করা যায়।

অবশ্য আঞ্চলিক মুদ্রা আলোচনার সময় অন্য এক ধরনের স্থানীয় মুদ্রার কথা লেখা যেতে পারে। আঞ্চলিক শাসকদের নামাঙ্কিত মুদ্রারাজির প্রবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে 'নাগরিক' মুদ্রারও প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি তামার মুদ্রার উল্লেখ করা যায়। এর একদিকে তগর বা তগরে কথাটি উৎকীর্ণ আছে। এটিকে প্রাচীন বিখ্যাত টগর নগরীর (বর্তমানে মহারাষ্ট্রের ওসমানাবাদ জেলার টের) নাম বলে শনাক্ত করা যেতে পারে।

দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর ভারতের মতোই দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় মৌর্যোত্তর যুগ ছিল ঘটনাবহুল। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এই সময়। সিসা ও পোটিন মুদ্রা তৈরির ধাতু হিসেবে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। সাধারণ দৈনন্দিন কেনাকাটার জন্য অল্প মূল্যের মুদ্রারই প্রচলন ছিল বেশি। মুদ্রার সাক্ষ্য আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর দেয়। এই যুগের মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরই দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন বংশের শাসন চালু হয়নি। এই দুই শাসনকালের মধ্যে ছিল লেখবিহীন এবং লেখসমেত আঞ্চলিক মুদ্রা প্রচলনের যুগ। (ক্রমশ)

গল্প

সাজিয়েছে

দীপা তালুকদার

"পা-পি-য়া," দাঁতে দাঁত চেপে কর্কশ স্বরে চিৎকার করে ওঠে মনীষা। মনীষার চিৎকার কানে যেতেই মুহূর্তের মধ্যেই নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের ভেতর।

বিয়েবাড়ি। আজ পাপিয়ার ছোটপিসির বিয়ে। সেই উপলক্ষে বাড়িতে নিমন্ত্রিতের ভিড়। ওদিকে বিয়ের আয়োজন চলছে। আর এদিকে ঘরের ভেতর একদল ছেলেমেয়ে বিয়েবাড়ির আনন্দকে উপলক্ষ করে মজা করবার উপকরণ খুঁজে চলেছে। হঠাৎ তারা আবিষ্কার করে পাপিয়াকে। ছোট্ট পাপিয়া। বছর সাতেক বয়স। ফরসা, ধবধবে গায়ের রং। একমাথা কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল, টিকলো নাক। ভাসা ভাসা দুটো চোখ। লাল টুকটুকে ঠোঁট। প্রথমে সবাই যায় আদর করতে। তারপর দ্যাখে, ওই মুখে কোনও ভাষা নেই। ঠোঁট দুটো নড়ছে বটে কিন্তু কোনও কথা বেরোয় না। নিমেষেই সবাই বুঝে যায় মেয়েটি বোবা এবং কালা সদা প্রস্ফুটিত গোলাপ, হঠাৎ সকলের কাছে পোকায় কাটা ধুঁদুল ফুল হয়ে যায়।

সমবয়সী বাচ্চাদের কারও-কারও মনে হল—যাক, এবার মজা করার মতো উপকরণ পাওয়া গেছে। হই-হই করতে-করতে কেউ এদিক থেকে খোঁচা মারে, কেউ ওদিক থেকে। কেউ মুখ খিঁচোয়, কেউ জিভ ভেঙায়, কেউ-বা চুল ধরে টানাটানি করে। কেউ-বা আবার মেরেও পালিয়ে যায়। ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করে পাপিয়া।

চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু হওয়ায় পাগলের মতো হাত দুটোকে বাড়িয়ে ঘুরতে থাকে মেয়েটা। আর ঘরভর্তি লোকজন মজা খুঁজে পায় পাপিয়ার ভঙ্গিমায়। এতক্ষণ যা ছিল ছোটদের কাছে মজা, এখন সেটা সংক্রামিত হয় বড়দের মধ্যেও। কেউ কেউ বলেন, "ও গুঙ্গি, তোকে কে সাজিয়েছে? ও বুবি, তুই কী রূপসী!"

নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে-করতে এ-ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। যখন একজন পাপিয়ার চুল থেকে ওর শখের সুন্দর ক্লিপ দুটো খুলে নেয়, তখন পাপিয়া আর থাকতে পারে না। অদ্ভুত এক ধরনের তীক্ষ্ণ চিৎকার তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। তার চিৎকারে ঘরের ভেতর সবাই আরও বেশি মজা খুঁজে পায়। এইসময়ই সেখান দিয়ে কী একটা কাজে মনীষা যাচ্ছিল। সম্পূর্ণ ঘটনাটাই সে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারছিল না সবাই নিমন্ত্রিত অতিথি। যাকেই বলতে যাবে সেই ব্যাপারটাকে কী সাঙ্ঘাতিক রূপ দেবে মনশ্চক্ষে তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল মনীষা মনীষা আরও জানে অতিথিরা যে-কোনও কারণেই অপমানিত বোধ করলেই তার পুরোটা দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। কেননা, সে এ-বাড়ির বউ। সর্বোপরি সে বোবা মেয়ের মা। তাই মনীষা কোনও কথা বলে না, বলতে পারে না। নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পা দুটোও যেন আটকে রয়েছে মাটির সঙ্গে। সারা শরীর অবশ, নিস্পন্দ। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে পাপিয়ার

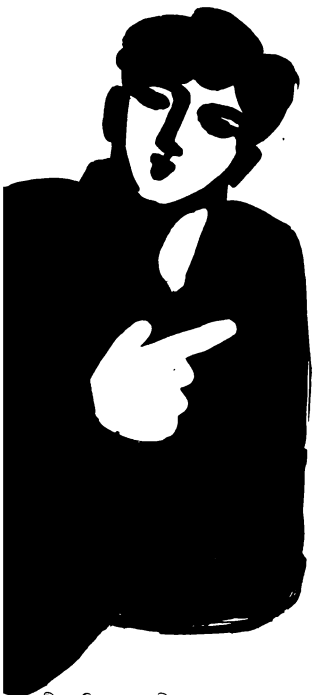

তীক্ষ্ণ চিৎকারে মনীষার যেন চমক ভাঙে। আর কাউকে কিছু বলতে না পেরে সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে বোবা মেয়েটার ওপর।

"পাপিয়া" বলে চিৎকার করেই ঘরের ভেতর ঢুকে মনীষা ঠাস-ঠাস করে মারতে থাকে পাপিয়াকে। আর পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে মনীষা, "কেন তুই আমাকে জ্বালাচ্ছিস ? তোকে নিয়ে আমি কী করি "

মার খেয়েও মুখ থেকে কোনও কথা বেরোয় না পাপিয়ার। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে মায়ের মুখের দিকে। বড় করুণ সে দুটি চোখের দৃষ্টি। কাঁদতেও যেন ভুলে গিয়েছে। যারা এতক্ষণ মজা দেখছিল তারা সবাই আস্তে আস্তে সরে পড়েছে। কেউই এগিয়ে এল না পাপিয়াকে মারের হাত থেকে উদ্ধার করতে।

এবার দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে মনীষা। হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে। বিয়েবাড়ির সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে ম্লান হয়ে যায়। কেমন এক শূন্যতাবোধ গ্রাস করে মনীষাকে। বুকের ভেতরটা বড় জ্বালা করে। অসহায় মেয়েটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না।

হঠাৎ মাথায় কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে মুখ তোলে মনীষা। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ছোট দেওর শমীক। কোলে পাপিয়া। শান্তভাবে শমীক বলে, "কেঁদো না বউদি। আমি সব শুনেছি। আমি ওকে নিয়ে কলকাতায় যেতে চাই। ও আমার কাছেই থাকবে। ওর সমস্ত চিকিৎসার ভার আমার। ওকে তুমি আমার কাছে থাকতে দাও বউদি। দেখবে ও একদিন কথা বলতে পারবেই। যতদিন না ও ভালভাবে কথা বলতে পারছে, ততদিন তোমার কাছে ওকে নিয়ে আমি আসব না। তোমাকে কথা দিচ্ছি।"

মনীষা কেমন অবাক দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শমীকের দিকে। কোনও কথাই খুঁজে পায় না সে। তাদের এই জায়গায় কোনও ব্যবস্থাই নেই চিকিৎসার। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শমীকের হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেলে মনীষা। "তুমি পারবে শমীক ? পারবে ? পারবে আমার পাপিয়ার মুখে কথা ফোটাতে ?"

"পারব বউদি। আর সে-কথা বলার জন্যই তো আমি এবার তোমার কাছে ছুটে এসেছি। গত বছর বাইরে থেকে ফিরে এখানে এসে পাপিয়ার এইরকম অবস্থা দেখে আমার মনটা একদম ভেঙে যায়। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করি, কলকাতায় ফিরেই এবার আমি নিজেই শিখব কী করে বোবাদের কথা বলানো শেখাতে হয়। আমি শিখেছি বউদি।"

মনীষা তন্ময় হয়ে শোনে শমীকের কথা।

"ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেব। বাড়িতে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি ওকে শেখাব।"

"বোবারা আবার স্কুলে পড়ে নাকি ?" অবাক হয়ে জানতে চায় মনীষা।

"পড়ে না ? খুব পড়ে। তুমি কোনও খবরই রাখো না বউদি।" হাসতে-হাসতে বলে শমীক।

আবেগজড়ানো গলায় মনীষা বলে, "আসলে কী জানো, আমাদের এই নসিবপুরে তো ভাল ডাক্তারও নেই। কিছুই নেই। তাই নসিবপুরের মানুষেরা জানে না তাদের নসিবে কী আছে।"

একটু থেমে মনীষা আবার বলে, "তা হলে তুমি ওকে নিয়ে যাও শমীক। আমি অপেক্ষা করে থাকব সেই দিনটির জন্য।"

তারপরই বিষণ্ণ গলায় মনীষা বলে, "জানো তো, আমি ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে পর্যন্ত পারি না। আমি তাই নিজেকে একদম সরিয়ে এনেছি সব কিছু থেকে। যেখানেই যাই, সেখানেই শুনতে হয়, "ও মা, ও বুঝি কথা বলতে পারে না ? কী করবে গো তুমি এই বোবা মেয়েকে নিয়ে ? এরকম হল কেন ? তোমাদের বংশে কি কেউ··· ? কিংবা তোমাদের কারও কি কোনও অসুখ আছে ? ইস, আমরা সুস্থ ছেলেমেয়েদের নিয়েই হিমশিম খাই, তুমি এই বোবাটাকে নিয়ে কী করবে ? তোমার জন্য ভাই সত্যিই খারাপ লাগে।"

একটু দম নিয়ে মনীষা আবার বলে, "আমি পারি না শমীক, আমি পারি না এইসব কথা সহ্য করতে। মানুষের জিভে বড় বিষ। কেউ বোঝে না ওতে আমার কত কষ্ট হয়। এই বাচ্চাটার কত কষ্ট হয়। আর ওকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।" উত্তেজিত হয়ে পড়ে মনীষা।

"কে বলে বোবা-কালার শত্রু নেই ? আমি তো দেখলাম ওদেরই শত্রু বেশি।"

মনীষার অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে শমীক।

কয়েকদিন পর চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে পাপিয়াকে বিদায় দেয় মনীষা। যাওয়ার সময় শমীকের হাত দুটো ধরে বলে, "এখন থেকে তুমিই ওর সব শমীক। ওকে তোমার মতো করে গড়ে তোলো।"

শমীক কলকাতায় এসে প্রথমেই পাপিয়াকে নিয়ে যায় ই· এন· টি·-র কাছে। ডাক্তারবাবু ভাল করে পাপিয়াকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, "ওর জন্য একটা হিয়ারিং এইড কিনতে হবে। তারপর স্পিচ থেরাপির সাহায্যে আস্তে-আস্তে কথা বলানো শেখাতে হবে।"

শমীক বলে, "ও কথা বলতে পারবে তো ডাক্তারবাবু ?"

"সেটা নির্ভর করছে ওর ওপর, ওর শিক্ষকের ওপর," ডাক্তারবাবু বললেন।

শমীক সেইদিনই একটা হিয়ারিং এইড কিনে নিয়ে এল। কিন্তু পাপিয়া কিছুতেই কানে পরবে না। অনেক বোঝানোর পর পাপিয়া রাজি হয় পরতে।

পাপিয়া শচীর-মা'র কাছে বাড়িতে থাকে। ওকে শমীক রেখেছে পাপিয়াকে দেখাশোনা করার জন্য। ওই বাড়িতে আরও কয়েকঘর ভাড়াটে থাকে। তাদের বেশ কয়েকটি

ছেলেমেয়ে আছে। সবাই প্রায় পাপিয়ারই সমবয়সী।

পরদিন যথারীতি অফিসে যায় শমীক।

সন্ধের পর বাড়িতে ফিরে শমীক দ্যাখে পাপিয়া বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কাঁদছে। মেঝেয় গড়াচ্ছে হিয়ারিং এইডটা। শমীক ব্যস্ত হয়ে পড়ে পাপিয়ার কান্না থামাতে। পাপিয়া তাকে কী বোঝাতে চেষ্টা করে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না সে। এইসময় শচীর-মা এসে জানায়, বিকেলবেলায় অন্য ভাড়াটের বাচ্চাগুলো খেলতে আসে পাপিয়ার সঙ্গে। আসার পরই ওদের চোখ পড়ে পাপিয়ার কানে লাগানো ওই যন্ত্রটার দিকে। এ এটা ধরে টানে, ও ওটা ধরে। পাপিয়াকে উত্ত্যক্ত করে তোলে। শচীর-মা'র শত নিষেধেও কাজ হয় না। ওরা কথা শোনেই না। পাপিয়ার অসহায় ভাবভঙ্গিগুলোকে ওরা নকল করে দেখাতে থাকে।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পরই রাগে, দুঃখে যন্ত্রটা কান থেকে টেনে খুলে ফেলে দেয় পাপিয়া। তারপরই বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কাঁদতে থাকে। স্তব্ধ হয়ে বসে সব শোনে শমীক। তারপরই স্থির করে এই বাড়িটা তাকে ছাড়তে হবে। এমন একটা বাড়িতে যেতে হবে যেখানে শুধু তারা ছাড়া আর কেউই থাকবে না।

পাপিয়ার কান্না থামিয়ে ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায় শমীক। ডাক্তারবাবুর কাছে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিতে-দিতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে সে। একই ঘটনা ঘটে চলেছে বারংবার।

ডাঃ রায় শান্তভাবে বললেন, "আপনি ধৈর্য ধরুন মিঃ বোস। তবে এটা সত্যি কথা যে, এইরকম ঘটনার জন্যই বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই কানে এই যন্ত্রটা লাগাতে চায় না, যখন আস্তে-আস্তে কথা বুঝতে পারে, তখন ওরা দ্যাখে, যে-কোনও লোক ওদের কানে এই যন্ত্রটা দেখেই একটু হেসে বলবে, 'ও, কালা, তাই তো বলি।' অন্য কেউ সঙ্গে থাকলে তার সঙ্গেও খানিকটা হেসে নেবে এই ব্যাপার নিয়ে। যেন ব্যাপারটা খুবই মজার। আমারও খুব দুঃখ হয় মিঃ বোস, বেশিরভাগ সুস্থ মানুষই অসুস্থ মানুষের কষ্টটা উপলব্ধি করতে পারে না।"

একটু থেমে ডাঃ রায় আবার বললেন, "অথচ, মজার ব্যাপার দেখুন। এই যে আমি। আমার চোখে পুরু কাচের চশমা। চশমা খুললেই আমি একেবারেই অন্ধ। কিন্তু আমাকে কেউ অন্ধ বা কানা বলবে না। বরং মর্যাদা দিয়ে বলবে, 'দারুণ ভাল স্টুডেন্ট ছিলেন ডাক্তারবাবু। পড়তে-পড়তে চোখ দুটো একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে।' অথচ, ওদের বেলা? শুধুই অবহেলা। এই তো অবস্থা।"

শমীক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ডাঃ রায় আবার বলেন, "আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, ওকে বুঝিয়ে আবার লাগান যন্ত্রটা। আর, আপনি তো জানেনই, কী করে কথা বলাতে হয়। সেইমতো চেষ্টা করতে থাকুন। তবে, অবশ্যই মূক-বধির বিদ্যালয়ে ওকে ভর্তি করে দেবেন। তা হলে উন্নতিটা আরও তাড়াতাড়ি হবে।"

॥ ২ ॥

দিন কয়েকের মধ্যেই একটা সুন্দর বাড়ি পেয়ে যায় শমীক। নতুন বাড়িতে এসে অনেকটা নিশ্চিন্তবোধ করে সে। নিশ্চিন্ত মনে পাপিয়াকে নিয়ে পরদিন স্কুলে যায়। বিরাট স্কুল। আর কী যে সুন্দর। চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। স্কুলের ভেতর যেমন সুন্দর বাগান তেমনই সুন্দর খেলার মাঠ। এক নিমেষেই স্কুলটা খুব পছন্দ হয়ে গেল শমীকের।

অফিসে গিয়ে শমীক অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে দেখা করল।

ভদ্রলোক পাপিয়াকে দেখার পর জানতে চান, "এতদিন কোনও চিকিৎসা করাননি?"

"না," কুণ্ঠিতভাবে বলে শমীক।

"কেন? এটাই তো খুব ভুল করেন আপনারা।"

"না, মানে

শমীককে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ভদ্রলোক বলে চলেন, "এই তো হয়েছে অবস্থা, বেশিরভাগ বাবা-মা বোবা-কালা ছেলেমেয়েদের লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখতে চান। তারপর যখন বের করেন তখন দেখা যায় তাদের শিক্ষা গ্রহণের বয়স আর থাকে না। তা, আপনি এতদিন কোনও চিকিৎসাই করাননি?" ভদ্রলোকের স্বরে বিরক্তি।

"না, মানে, আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি। সেখানে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই নেই।" আমতা-আমতা করে বলে শমীক।

"বুঝলাম। তা এখন আপনি কী ঠিক করছেন? ওকে নিশ্চয় হস্টেলে রাখবেন।" বলেই উনি একনাগাড়ে বলতে থাকেন, "আপনাদের আর কী? কোনওরকমে স্কুলে ভর্তি করে হস্টেলে ফেলে দিয়ে চলে যাবেন। সবই তো এখন ফ্রি, হস্টেলেও মাত্র ৪৫ টাকা চার্জ। ব্যস, কোনওরকমে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই তো ল্যাটা চুকে গেল। তারপর তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা আর

কোনও খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনই মনে করেন না। এমনকী,অনেকে স্কুল ছুটির সময় পর্যন্ত বাড়িতে নিয়ে যেতে চান না। অনেকে তো নেনই না। তা, এখন আপনি কী করবেন? আপনি কোন দলে? নেওয়ার দলে, না, না-নেওয়ার দলে?"

এইবার শমীক হাসতে-হাসতে বলে, "আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি এখানে বাড়ি ভাড়া করেছি। ও বাড়িতেই থাকবে। আর আমি নিজেও কথা বলাতে হয় কী করে তার ট্রেনিং নিয়েছি। যতক্ষণ ও বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ আমি ওকে শেখাব।"

এইবার ভদ্রলোক রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন, "তাই নাকি? আপনি ট্রেনিং নিয়েছেন? খুব ভাল কথা, কিন্তু এ আপনার কে হয় জানতে পারি কি?"

এইবারও মৃদু হেসে উত্তর দেয় শমীক, "ও আমার ভাইঝি।"

"বটে, বটে। ভাইঝির জন্য ?" আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গিতে খুব মজা লাগছিল শমীকের। তবু সে গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে বলল, "কাউকে না কাউকে দায়িত্ব

তো নিতেই হবে।"

"খুব ভাল, খুব ভাল।" বলতে-বলতে ভদ্রলোক সাগ্রহে পাপিয়াকে ভর্তি করে নিলেন।

পরদিন থেকে শুরু হল পাপিয়ার শিক্ষা আর শমীকের সাধনা। পাপিয়াকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। জেদ চেপে গেছে শমীকের।

আবার কানে যন্ত্র লাগাল পাপিয়া। শুরু হল শিক্ষা। কপালগুণে রেণুদির মতন শিক্ষিকার সাহচর্যে এল সে। রেণুদি যত্ন করে ধরে-ধরে কথা শেখান। অসীম ধৈর্য তাঁর। মেয়েটাকে এত ভালবেসে ফেললেন তিনি যে, অক্লান্তভাবে তার পেছনে পরিশ্রম করতে শুরু করলেন। শমীক যখন কলকাতার বাইরে যায়, রেণুদির কাছেই থাকে পাপিয়া। রেণুদিকে সেও আঁকড়ে ধরে। ক্রমশ ঠোঁটের নড়াচড়া অনুসরণ করতে শেখে পাপিয়া।

শমীক লক্ষ করে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তার মামণির মনমরা ভাবটা একদম কেটে গেছে। দিন-দিন হাসি-খুশি উচ্ছল হয়ে উঠছে সে। এখন তার কত বন্ধু।

যতক্ষণ বাড়িতে থাকে পাপিয়া, ততক্ষণ শমীক ধৈর্য সহকারে কথা বলানো শেখায় তাকে। এক-একসময় হতাশায় ভেঙে পড়ে। তখনই মনে পড়ে, বউদিকে সে কথা দিয়েছে। অবশেষে স্কুলের শিক্ষকদের প্রচেষ্টায়, শমীকের অক্লান্ত পরিশ্রমে, পাপিয়ারও নিজের উদ্যমে একদিন মুখে কথা ফোটে 'মা'। সেদিন কী আনন্দ শমীকের। পাগলের মতো পাপিয়াকে কোলে নিয়ে নাচতে থাকে। আস্তে-আস্তে বলতে শেখে 'বাবা, কাকা'। কাকা ডাক শুনে শমীক সেদিন আনন্দে আত্মহারা। ক্রমশ পাপিয়া একটি-দুটি করে কথা বলতে শুরু করে। আস্তে-আস্তে সম্পূর্ণ বাক্য। ছবির মাধ্যমে শিখতে থাকে কোন্‌টা কী। শমীক কোনও-কোনও ছুটির দিনে নিয়ে যায় চিড়িয়াখানায়। জীবজন্তুর সঙ্গে আলাপ করায়। নাম শেখায়। খুব খুশি পাপিয়া। কোনওদিন নিয়ে যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে, কোনওদিন মিউজিয়ামে। হেলেন কেলারের জীবনী শোনায় বারবার। তিনি শুধু বোবা-কালাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্ধও। চোখেও দেখতে পেতেন না। তবুও ভাগ্যের কাছে পরাজয় মানেননি সে।

পাপিয়ার তো তবু চোখ আছে। এখন আস্তে-আস্তে কথা বলাও শিখছে। সুতরাং তাকে বড় হতে হবে, অনেক বড়। হেরে গেলে চলবে না। কানের কাছে ক্রমাগত মন্ত্রের মতো আওড়াতে থাকে শমীক।

একদিন অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে শমীক কাছে টেনে আনে পাপিয়াকে। তারপর বুকে চেপে ধরে বলে, "মামণি, তুই নিজেও হারিস না, আমাকেও হারতে দিস না।"

শমীকের গলার স্বর ভারী। চোখে জল। ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে পরম যত্নে কাকুর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আদর করে পাপিয়া।

দিনের পর দিন এই ধরনের কথা শুনতে-শুনতে জেদ চেপে যায় পাপিয়ার। এখন সে বোঝে সব। অনুভবও করতে পারে। এখন আর নিজের অসহায়ত্বকে একটুও গুরুত্ব দেয় না সে। নিজের মনেই বলে, "আমার তো তবুও চোখ দুটো আছে। হেলেন কেলারের তো তাও ছিল না।"

কখনও যদি ভুল করেও কাকুর সঙ্গে ইশারায় কথ বলা শুরু করে সে, তখনই দ্যাখে, কাকুর মুখটা আস্তে-আস্তে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। কাকু সজোরে মাথা নাড়তে-নাড়তে বলে, "ইশারায় নয়, ইশারায় নয়। ঠোঁট নাড়ো। আমার সব কথার উত্তর কথায় দাও।"

কিছুতেই শমীক ইশারায় কথা বলে না ওর সঙ্গে। কেননা, রেণুদি বারবার বলে দিয়েছেন, ওর সঙ্গে যতটা পারবেন, কথা বলবেন। কানে শোনার মধ্যে থাকলে ইমপ্রুভ হবে তাড়াতাড়ি। ওকে যতটা সম্ভব টিভির প্রোগ্রাম দেখাবেন, তা হলে আরও তাড়াতাড়ি লিপ রিডিং আয়ত্ত করতে পারবে।"

সেভাবেই এগিয়ে যায় শমীক।

প্রতিটি ক্লাসে প্রথম হয় পাপিয়া। সেলাইয়ে, খেলাধুলোয় পারদর্শী হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে কেটে গেল পাঁচ-পাঁচটা বছর।

একদিন শমীক, পাপিয়াকে দিয়ে চিঠি লেখায় তার মায়ের কাছে।

"শ্রীচরণেষু

মা, আমি আর কাকু সামনের মাসে তোমার কাছে যাব। তুমি ও বাবা প্রণাম নিও। ছোটদের ভালবাসা দিও।

পাপিয়া।"

পাপিয়ার চিঠি হাতে নিয়ে আনন্দে মনীষা স্তব্ধ।

অবশেষে সত্যিই একদিন পাপিয়াকে নিয়ে শমীক পৌঁছয় তাদের বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকেই মাকে প্রণাম করে পাপিয়া বলে, "মা, আমি এসেছি।"

মায়ের দুই চোখে জলের ধারা। পাপিয়াকে বুকে চেপে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে মনীষা। সবটাই স্বপ্ন মনে হয় তার কাছে।

এইবার শমীক স্নিগ্ধ স্বরে বলে, "আমি আমার কথা রেখেছি বউদি। ওখানকার পড়া শেষ হলে কোনও নর্মাল স্কুলে ভর্তি করে দেব ওকে। ও অনেক, অনেক বড় হবে বউদি, অনেক বড়।"

॥ ৩ ॥

আজ পাপিয়া পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট। উচ্চশিক্ষার জন্য যাচ্ছে আমেরিকায়। মা, বাবা, ভাইবোন, কাকু এসেছে সি-অফ করতে।

এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে শমীক, বউদিকে বলে, "দেখলে তো বউদি, আমি জিতে গেছি। মামণি আমাকে জিতিয়ে দিয়েছে, বলো!"

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে মনীষা।

প্লেনটা উড়তে আরম্ভ করতেই মনে-মনে কাকুকে প্রণাম করে বিড়বিড় করে বলতে থাকে পাপিয়া, "আমি পেরেছি কাকু। আমি পেরেছি। তোমার মুখ আমি রেখেছি। আমি নিজেও হারিনি, তোমাকেও হারতে দিইনি।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

খেলাধূলা

কবাডিতে এই কি প্রথম ও শেষ সোনা

এশিয়াডে সোনাজয়ী ভারতের কবাডি দলের কথা লিখেছেন আশিস উপাধ্যায়

ভারতের গ্রামে-গঞ্জে অনেককেই কবাডি খেলতে দেখা যায়। কিন্তু ফুটবল-ক্রিকেটের যুগে খেলাটির প্রতি তেমন গুরুত্ব বোধ হয় দেওয়া হয় না। ছেলেরা অনেকেই কবাডি খেলে, কিন্তু এই খেলাটিই যে এবারের এশিয়াডে ভারতকে একমাত্র সোনা এনে দেবে, তা কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। আরও বড় কথা, এশিয়াডে এবারই প্রথম কবাডি খেলাটি অন্তর্ভুক্ত হল। সুতরাং অন্তর্ভুক্তির বছরটিতেই কবাডিতে ভারতের সোনা জয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকবে। এই কৃতিত্বের জন্য কোচ সি প্রসাদ রাও-এর সঙ্গে কবাডি দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

খেলা হয়েছিল রাউণ্ড রবিন প্রথায়। ভারত নেপালকে ৪৩-১১, চিনকে ৪৬-১৫, জাপানকে ৪৪-১৮, পাকিস্তানকে ৪৮-১৩ এবং বাংলাদেশকে হারায় ৫২-১৭ পয়েন্টে। ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য এই ফলাফল থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সোনাজয়ী ভারতের কবাডি দলে ছিলেন অশোক সিন্ধে, এস রাজারত্নম, আনজার আলি, অনিলকুমার তানওয়ার, শ্রীরামাজু ভাবসার, হরদীপ সিং, কৃষ্ণকুমার গোদারা, ওমপ্রকাশ নরওয়াল, রণধীর সিং, তীর্থরাজ চিকিরা ও অসনকুমার সাংওয়ান। অধিনায়ক ছিলেন হরদীপ সিং। আর এই দলে ছিলেন বাংলার একমাত্র খেলোয়াড় আনজার আলি।

বেজিং এশিয়াডে ভারতের ফলাফল যখন এক কথায় শোচনীয়, তখন একমাত্র আশার আলো দেখিয়েছে এই কবাডি দল। এবার থেকে যেন এই খেলাটির প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের শুরুটা হয় ভাল। কিন্তু ক্রমেই আমরা পিছিয়ে পড়ি। অন্যান্য দেশ আমাদের পেছনে রেখে অনেক এগিয়ে যায়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাবই আমাদের ব্যর্থতার মূল কারণ। আমরা অনেকাংশেই পরিশ্রমবিমুখ। কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে কোনও কাজে হাত দিতে পারি না। ফলে জাতীয় জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। খেলার মাঠেও পড়েছে তার কালো ছায়া। এখন কবাডির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি খেলার প্রতিই গুরুত্ব দেওয়া হোক। আগামী এশিয়াডে যেন আমরা পুরোভাগে থাকতে পারি।

কবাডি ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ খেলা। বিশেষ করে বাংলার। বাংলার মনীষীরা শারীরচর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এই খেলাটির প্রতি কিশোর ও তরুণদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বারবার। বস্তুত এশিয়ায় এই খেলাটিতে ভারত যে চ্যাম্পিয়ান তা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম এশিয়ান কবাডি চ্যাম্পিয়ানশিপ। সেই খেলায় ভারত জয়ী হয়। ১৯৮২-তে নয়াদিল্লির এশিয়াডে কবাডি ছিল প্রদর্শনী খেলা। প্রতিযোগিতামূলক না হলেও সেই অনুষ্ঠানেও ভারত জয়ী হয়েছিল। ১৯৮৭-তে কলকাতায় এবং ১৯৮৯-তে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত 'সাফ

বিজয় মুহূর্তে কোচ ও ভারতীয় খেলোয়াড়রা

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

এবারের এশিয়াডে চিনা খেলোয়াড়দের জয়-জয়কার। কিন্তু কবাডিতে চিনা খেলোয়াড়রা ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে একেবারেই এঁটে উঠতে পারেননি। কবাডিতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সহজাত দক্ষতার কাছে হার স্বীকার করেছে চিন। তবে শুধু চিন নয়, এশিয়ার কোনও দেশই কবাডিতে ভারতকে হারাতে পারিনি। বেজিং এশিয়াডের অনেক আগে থেকেই কবাডিতে ভারত এশিয়া চ্যাম্পিয়ান।

গেম্‌স'-এও ভারত হয়েছিল চ্যাম্পিয়ান। ১৯৮৯-তেই জয়পুরে হয়েছিল দ্বিতীয় এশিয়ান কবাডি চ্যাম্পিয়ানশিপ। সেই প্রতিযোগিতাতেও ভারত জয়ী হয়। এবার বেজিং এশিয়াডে ভারতের কবাডি দল ছিল ফেভারিট। সবার প্রত্যাশা পূরণ করেছেন ভারতের কবাডি খেলোয়াড়রা।

কিন্তু দুঃখের কথা, ১৯৯৪-এ হিরোশিমায় যে এশিয়াডের আসর বসছে সেখানে আর কবাডিকে প্রতিযোগিতামূলক খেলা হিসেবে রাখা হয়নি। বহু চেষ্টা করেই বেজিং এশিয়াডের মূল প্রতিযোগিতায় কবাডিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এশিয়ান গেম্‌সে আপাতত এটাই প্রথম ও শেষ কবাডি প্রতিযোগিতা। জাপান যেখানে এশিয়ায় বেস বল, শফ্‌ট বলের মতো পাশ্চাত্যের বিভিন্ন খেলার প্রচলন ও বিকাশের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে সেখানে কবাডি অবহেলিতই থেকে গেল। সোনা জয়ের পর ভারতের দায়িত্ব বেড়ে গেল। এশিয়াডে পূর্ণ মর্যাদায় কবাডিকে প্রতিষ্ঠার জন্য এখন থেকেই ভারতকে চেষ্টা চালাতে হবে।

এশিয়ান গেমস্-এ ভারোত্তোলনে ভারতীয় মেয়েরা ভাল করলেও চিনা মেয়েরা অনেক এগিয়ে। বেজিং থেকে লিখেছেন **প্রদীপ পল**

মেয়েদের ভারোত্তোলনে

জ্যোৎস্না দত্ত

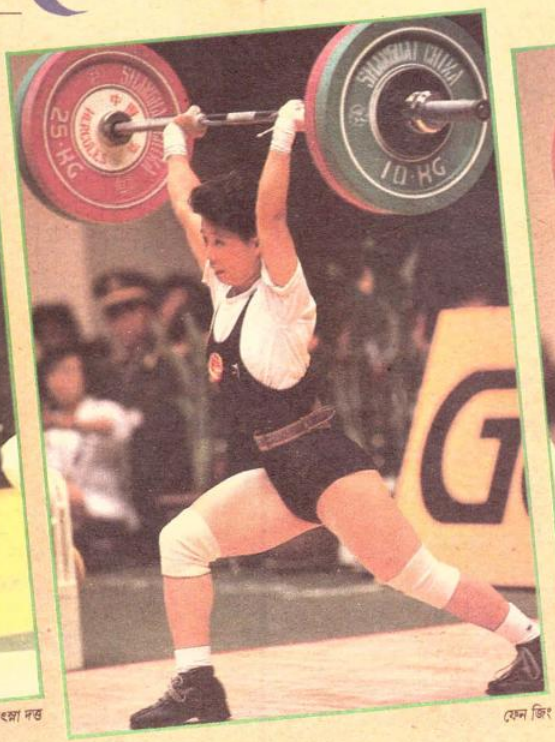

ফেন জিং

বেজিং এশিয়ান গেমস শুরুর প্রথম দিন থেকেই চিনের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা যে আধিপত্য দেখিয়েছেন, তার অভ্রান্ত প্রমাণ জ্বলজ্বল করছে পদকতালিকায়। কিন্তু মেয়েদের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় চিনা মেয়েরা যে কাণ্ড করেছেন, তা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনই অবিশ্বাস্য। মেয়েদের ভারোত্তোলনের ন'টি 'ইভেন্ট'-এই সোনা পেয়েছেন চিনা মেয়েরা। কিন্তু এটাই একমাত্র চমক নয়। বিভিন্ন ইভেন্টে যাঁরা রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতেছেন, তাঁদের চেয়ে চিনা মেয়েরা অনেক এগিয়ে আছেন। কতটা এগিয়ে আছেন, কী বিপুল ভার তাঁরা তুলতে পেরেছেন, এটা শুনলে অবাক হতে হয়। মেয়েদের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ৪৪ কেজি বিভাগে (স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক) সোনা জেতেন ফেন জিং। তিনি তুলেছেন ১৬৫ কেজি। ৪৮ কেজি বিভাগে জিয়াও উ হুয়াং ১৬৭.৫ কেজি ভার উত্তোলন করে সোনা পেয়েছেন। ৫২ কেজি বিভাগে মোট ১৮৫ কেজি ওজন তুলে সোনা পেয়েছেন লি পিং পেং। ৫৬ কেজি বিভাগে মোট ১৯০ কেজি ওজন তুলে সোনা পান লি উই জিং। ৬০ কেজি বিভাগে ২০৭.৫ কেজি ওজন তুলেছেন না মা। তিনি সোনা জিতেছেন। ভারোত্তোলনে এভাবে সোনা জিতেছেন চিনের অন্য মেয়েরা। কিন্তু ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে যে দুস্তর ব্যবধান তাঁরা গড়ে তুলেছেন সেটাই বিস্ময়কর। আর-একটা কথাও এখানে বলে রাখা দরকার। রুপোজয়ী খেলোয়াড় তৃতীয় ও শেষবারের চেষ্টায় যে ওজন তুলেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, চিনা মেয়েরা প্রথমবার ওজন তুলতে এসেই তার চেয়ে বেশি ওজন তুলেছেন। আশ্চর্য তাঁদের আত্মবিশ্বাস! তাঁরা বোধ হয় আগে থেকেই জানতেন, সোনা জিতবেন। ৫৬ কেজি বিভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন ইভেন্টে সোনাজয়ী চিনা মেয়েদের সঙ্গে অন্যদের তফাত ছিল ১০ কেজির। কিন্তু অন্য বিভাগগুলিতে ২৫ থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত ব্যবধান দাঁড়িয়েছিল। ৭২.৫ কেজির বেশি

সোনা ও রুপোয় দুস্তর ব্যবধান

কুঞ্জরানি দেবী

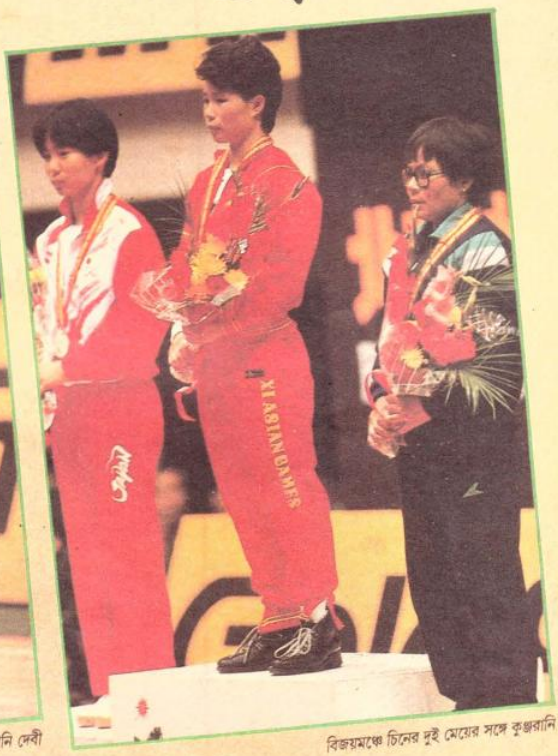

বিজয়মঞ্চে চিনের দুই মেয়ের সঙ্গে কুঞ্জরানি

বিভাগে চ্যাং মেই হান সোনা জেতেন। এই বিভাগে রুপো জিতেছেন ভারতের জ্যোৎস্না দত্ত। তাঁর চেয়ে ৫৫ কেজি ওজন বেশি তুলেছেন চ্যাং মেই হান। ভারতী সিং রুপো পেলেও তাঁর চেয়েও ৪০ কেজি বেশি ওজন তুলেছেন চিনের মেয়ে।

ভারতীয় মেয়েরা ভারোত্তোলনে যথেষ্ট ভাল ফল করেছেন। তবু তাঁরা চিনা মেয়েদের ধারেকাছেও আসতে পারেননি। ৪৪ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন ভারতের কুঞ্জরানি দেবী। সোনা পেয়েছেন চিনের যে-মেয়েটি তিনি কুঞ্জরানির চেয়ে ২৫ কেজি ওজন বেশি তুলেছেন। ৫২ কেজি বিভাগে ছায়া আদক পেয়েছেন ব্রোঞ্জ। তাঁর চেয়ে ৩২·৫ কেজি ওজন বেশি তুলে সোনা পেয়েছেন চিনের মেয়ে।

চিনা মেয়েদের এই সাফল্যের কারণ কী? ভারতীয় মহিলা দলের ভারোত্তোলন দলের কোচ সেলভান বলেছেন, "একেবারে কচি-কাঁচা বয়সেই চিনা মেয়েরা ভারোত্তোলন শুরু করে। চিনে আছে ১০ লক্ষেরও বেশি ভারোত্তোলক।"

ভারতীয় দলের ম্যানেজার গোপাল কানরার মতে, ভারোত্তোলনে বেশিরভাগ ভারতীয় মেয়েই আসেন দরিদ্র পরিবার থেকে। পুষ্টিকর খাদ্য এঁরা অনেকেই পান না। জাতীয় স্তরে পৌঁছনোর পর জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে এঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু শিবির ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেলেই সেই আগের অবস্থা। অন্য দিকে, চিনের সম্ভাবনাময় পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের একেবারে অল্প বয়সেই জাতীয় ক্রীড়া কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য তারা পায়। এভাবেই তারা এমন এক ক্ষমতা অর্জন করে, যা এককথায় অতিমানবিক। চিনের সুপারহেভিওয়েট চ্যাং মেই হান এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন। ৭২·৫ কেজির বেশি বিভাগে তিনি ২৪২·৫ কেজি ভার তুলে সোনা জেতেন। ওই বিপুল ভার তোলার সময় তাঁর কপালে এক বিন্দু ঘামও দেখা যায়নি।

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

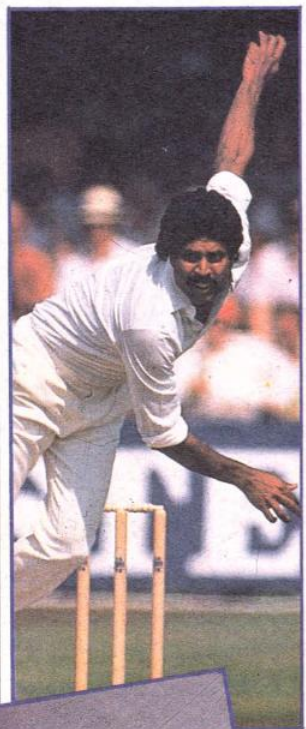

কপিলদেব

নরেন্দ্র হিরওয়ানি

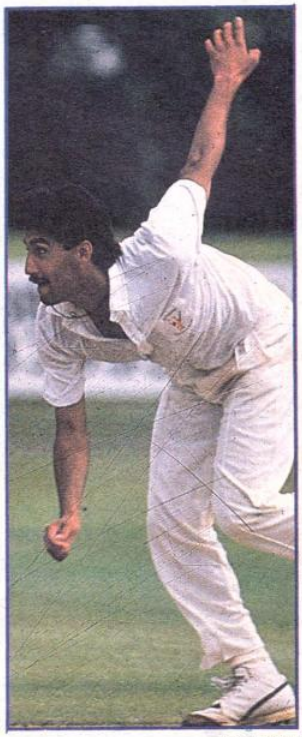

অতুল ওয়াসন

মনোজ প্রভাকর

ভারতের বোলিং-শক্তি কি শেষ হয়ে গেছে

ভারতীয় বোলিং-শক্তি এখন একেবারে অন্তঃসারশূন্য। বোলাররা কি আর ম্যাচ জেতাতে পারবেন না ? আলোচনা করেছেন নির্মল ঘোষ

কথাটা মজা করে লেখা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার। এবারের ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের শেষে গ্রাহাম গুচের উদ্দেশ্যে লন্ডনের একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে, "দারুণ ব্যাটিং এবং প্রচুর রান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আর আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ভারতীয় বোলারদের। এর আগে কখনও কি আপনি এত নিরীহ বোলিংয়ের সম্মুখীন হয়েছেন ?" কথাগুলি খুবই সত্যি। গুচের দক্ষতাকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, এরকম দুর্বল বোলিং সাম্প্রতিককালে আর দেখা যায়নি। ভারতীয় দল দেশের মাটিতে শেষ টেস্ট ম্যাচ জিতেছিল দু' বছর আগে, হায়দরাবাদে, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। আর বিদেশের মাটিতে ভারত জয়

পায় প্রায় চার বছর আগে, ১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মে, ইংল্যান্ডে। ভারতীয় ব্যাটিং যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বোলাররাই বারবার দেশকে জয় থেকে বঞ্চিত করেছেন। বিপক্ষকে অল্প রানে বেঁধে রাখতে তাঁরা বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। তার ফলে 'জয়' শব্দটা এখন আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি। ভারতীয় বোলিং-শক্তির দুর্বলতা এখন এত প্রকট কেন? প্রধান কারণ হিসেবে মনে হয়, অতিরিক্ত কপিলদেব-নির্ভরতা। এক দশকের ওপর কপিলদেবই ভারতের এক নম্বর বোলার। শুধু তাই নয়, বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের ওপর যখন যতটুকু চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা করেছেন কপিলই। ভারতের স্ট্রাইক বোলার কপিলদেবই। কিন্তু কপিলের সঙ্গে যাঁরা বল করেছেন, তাঁদের সঙ্গে কপিলের মানের বিরাট ব্যবধান রয়ে গেছে, তবে তেমন কিছু বোঝা যায়নি, যেহেতু কপিলদেব সাফল্য পেয়েছেন। কপিলের সাফল্য তাঁদের ব্যর্থতাকে ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু কপিলেরও তো বয়স হয়েছে। খেলা হয়ে গেল ১০৯টি টেস্ট, উইকেট নিয়েছেন ৩৭১টি। কপিলের শরীর এখন আর বইছে না। এ ছাড়া কয়েক বছর আগে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করার ফলে কপিলদেব এখন আর সেরকম গতিতে বলও করতে পারছেন না। সাফল্যও পাচ্ছেন না তেমন। ফলে ভারতীয় বোলিং-শক্তির অন্তঃসারশূন্যতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।

সঞ্জীব শর্মা

গত পাকিস্তান সফরের পর ভাবা হয়েছিল মনোজ প্রভাকর হয়ে উঠবেন কপিলদেবের সঙ্গী। পাকিস্তানের উইকেটকে কাজে লাগিয়ে চমৎকার সুইং বল করেছিলেন মনোজ। ইমরান এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের দারুণ চাপের মুখে ফেলেছিলেন। ভাবা হয়েছিল বেশ কিছুদিন পর টেস্টে ফিরে এসে এবার ইংল্যান্ড সফরেও মনোজ সাফল্য পাবেন। কিন্তু তা হয়নি। প্রয়োজনের মুহূর্তে জঘন্য বল

রবি শাস্ত্রী

করেছেন, ব্যাটসম্যানদের ওপর কোনও প্রভাবই বিস্তার করতে পারেননি। ৩টি টেস্টে মনোজ পেয়েছেন মাত্র ৮টি উইকেট, গড় রান দিয়েছেন উইকেট প্রতি প্রায় ৭০!

যতখানি সাড়া জাগিয়ে শুরু করেছিলেন নরেন্দ্র হিরওয়ানি, ঠিক ততখানিই নিঃশব্দে যেন মুছে যাচ্ছেন। তাঁর স্পিনের ভেলকি যে একেবারে সাময়িক, তা এখন বোঝা যাচ্ছে। যে কারিকুরির জন্য বিখ্যাত ছিলেন ভারতীয় স্পিনাররা, তার ভগ্নাংশও দেখা যাচ্ছে না হিরওয়ানির মধ্যে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সাফল্য পাননি তিনি, কিন্তু এবারের ইংল্যান্ড সফরে একেবারে ব্যর্থ তিনি। এই সীমায়িত বোলিং দক্ষতা নিয়ে হিরওয়ানি কতদিন দলে টিকে থাকতে পারবেন?

তরুণ অনিল কুম্বলে জীবনের প্রথম বিদেশ সফরে প্রায় ব্যর্থ। স্পিন বোলিংয়ে বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের বেঁধে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু আউট করার ক্ষমতা তাঁর খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বলে বৈচিত্র্যের বড় অভাব। অতি সাধারণ মানের স্পিন বোলিং খেলতে বিশ্বের প্রায় সব ব্যাটসম্যান এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সুতরাং কুম্বলের ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল তা এখনই বলা যায় না। আর-এক স্পিনার বেঙ্কটপতি রাজুও কতখানি ছাপ ফেলতে পারবেন তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অতুল ওয়াসন চমক দিয়ে শুরু করলেও ভবিষ্যতে নিজের মান উন্নত না করতে পারলে দেশের হয়ে কিছুই করতে পারবেন না। সঞ্জীব শর্মাও অতি সাধারণ মানের বোলারের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, যদিও তিনি সুযোগ পেয়েছেন। রবি শাস্ত্রীর বলে এখন ধারাবাহিকতা থাকলেও গভীরতা অনেক কমে গেছে। অর্থাৎ, মোটামুটি একটা মান রেখে তিনি বল করে যান ঠিকই, কিন্তু তা ব্যাটসম্যানকে খুব একটা অস্বস্তিতে ফেলতে পারে না।

এই বোলিং-শক্তি নিয়ে সত্যিই কি ভারত জেতবার আশা করতে পারে? সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, আমাদের বোলিং ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় বোলাররা যেখানে ৫৫টি উইকেট পেয়েছিলেন উইকেট পিছু ৩৬·৯৮ রানের বিনিময়ে, পাকিস্তানে সেটি দাঁড়ায় উইকেট পিছু ৫৩·৪৮ রান এবং এবার ইংল্যান্ডের ৩৬টি উইকেট তাঁরা দখল করেন ৭১·৬৯ রানের বিনিময়ে! এর ওপর কিছুদিনের মধ্যে কপিলদেব অবসর নিলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবতেও ভয় হয়।

এক নম্বরে মার্ক টেলর

অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ব্যাটসম্যান মার্ক টেলর সম্প্রতি কম্পিউটার রেটিং-এ বিশ্বে এক নম্বর নির্বাচিত হলেন। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন তমাল রায়

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট রসিকদের চোখের মণি এখন মার্ক টেলর। তাঁকে তুলনা করা হচ্ছে স্বয়ং ডন ব্রাডম্যানের সঙ্গে। সম্প্রতি কম্পিউটার বিচারে মার্ককে আবার পৃথিবীর এক নম্বর ব্যাটসম্যানের সম্মান দেওয়া হয়েছে। মাত্র কয়েকটি টেস্ট খেলেই এই সম্মান পাওয়া নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের পরিচায়ক। কী এমন করেছেন মার্ক যে,তাঁকে ভিভ রিচার্ডস, বর্ডার, বেঙ্গসরকর, গুচ, আজহারউদ্দিন, মিঁয়াদাদের ওপর রাখতে হবে ?

এক কথায় বলতে গেলে, মার্ক ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছেন। তাঁর খেলার স্টাইল এবং টেকনিক অত্যন্ত উচ্চ স্তরের। বিশেষজ্ঞরা নিউ সাউথ ওয়েলসের ছাব্বিশ বছরের এই তরুণের খেলা দেখে মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা যে কতখানি ঠিক, তার প্রমাণ দিয়েছেন মার্ক, গত বছর ইংল্যান্ডে রানের বন্যা বইয়ে দিয়ে। এবারে নিজেদের দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষেও ভালই খেলেছেন। এই সুবাদে বলার মতো একটি কাজও করে ফেলেন টেলর। ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান— সব দেশের বিপক্ষেই প্রথম খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব লাভ করেন।

মার্ক অ্যান্টনি টেলরের জন্ম ১৯৬৪ সালের ২৭ অক্টোবর। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে খেলা শুরু করেন মাত্র পাঁচ বছর আগে, ২১ বছর বয়সে, ১৯৮৫ সালে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি টেলর। বরং তাঁর অন্য পার্টনার স্টিভ স্মল অনেক বেশি নজর কেড়ে নেন। নিজের ওপর অবশ্য আস্থা হারাননি টেলর। আস্তে-আস্তে টেকনিকনির্ভর খেলা দেখিয়ে রাজ্য-দলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৮-'৮৯-এর মরসুমে চমৎকার ফর্ম দেখান, কয়েকটি সেঞ্চুরি করেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় খেলার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে নির্বাচিত হন। খুব বেশি রান পাননি টেলর, কিন্তু তাঁর ব্যাটিং টেকনিকের জোরে ইংল্যান্ড সফরকারী দলে স্থান পেয়ে যান। এমনকী, ওপেন করার দায়িত্ব দেওয়া হয় মার্শ আর টেলরকে, ডেভিড বুনকে বলা হয় তিন নম্বরে ব্যাট করতে !

মার্ক টেলর

ব্যাটিং ক্রমপর্যায়

১। মার্ক টেলর (অস্ট্রেলিয়া)
২। জাভেদ মিয়াদাদ (পাকিস্তান)
৩। গ্রাহাম গুচ (ইংল্যান্ড)
৪। ডেসমন্ড হেনস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
৫। রবিন স্মিথ (ইংল্যান্ড)
৬। রিচি রিচার্ডসন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
৭। অ্যালান বর্ডার (অস্ট্রেলিয়া)
৮। মহম্মদ আজহারউদ্দিন (ভারত)
৯। মাইক আথারটন (ইংল্যান্ড)
১০। ইমরান খান (পাকিস্তান)

অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকরা যে ভুল ব্যাটের ওপর নির্ভর করেননি তা প্রমাণ হয়ে যায় ইংল্যান্ডে। অচেনা-অজানা টেলরকে প্রথমে গুরুত্বই দিতে চাননি ইংল্যান্ডের বোলাররা। কিন্তু প্রথম টেস্ট থেকেই টেলর হয়ে গেলেন দুঃস্বপ্ন। হেডিংলিতে ১৩৬ রানের ঝোড়ো ইনিংসের সামনে উড়ে যেতে থাকে ইংল্যান্ডের আক্রমণ। এর পর তো রানের ঝড়, অথবা বন্যা ! শেষ হয় পঞ্চম এবং শেষ টেস্টে। টেস্ট ব্রিজে টেলর করেন ২১৯ রান। সঙ্গী মার্শের অবদান ১৩৮। প্রথম উইকেটে রেকর্ড গড়েন, পাহাড়প্রমাণ ৩২৮ রানের। সবসুদ্ধ টেলর রান করেন ৮৩৯। রাতারাতি অস্ট্রেলিয়াতেও প্রায় অপরিচিত টেলর হয়ে যান অতি পরিচিত।

দেশে ফিরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটি চমৎকার সেঞ্চুরিও খুঁতখুঁতে কিছু সমালোচকের মন ভরাতে পারেনি। তাঁদের বক্তব্য, সফরকারী ইমরান, আক্রমের পাকিস্তানের সঙ্গেই প্রমাণ হবে টেলরের দক্ষতা। দৃষ্টিনন্দন দুটি শতরান অবশ্য তৎক্ষণাৎ তাঁদের চুপ করিয়ে দেয়। ১৫টি টেস্টে ৬টি সেঞ্চুরি সহ ষোলোশোর বেশি রান— দুটি মরসুমে টেলরের সংগ্রহ যথেষ্টই ভাল বলা যায়। এত ভাল সংগ্রহ গত মরসুমে আর কোনও ক্রিকেটারের ছিল না। সুতরাং টেলর যে একদিন বিশ্বের এক নম্বর ক্রিকেটার হবেন তাতে আর সন্দেহ কী ! দুর্দান্ত ব্যাটিং টেকনিক, অসম্ভব রান ক্ষুধা— এই নিয়ে মার্ক টেলর যে নব্বই দশকও কাঁপাবেন এতে কোনও সন্দেহ নেই।

মাঠ ছাড়ছেন না সুব্রত

দীর্ঘ সতেরো বছর মোহনবাগানে খেলার পর অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুব্রত ভট্টাচার্য। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **সমীরণ সেন**

মোহনবাগান ক্লাবের ষোলো নম্বর জার্সিটি আর কোনও খেলোয়াড়কে পরতে দেখা যাবে না। দীর্ঘ সতেরো বছর এই জার্সিটি পরেই ময়দানে কাটিয়ে গেলেন রক্ষণভাগের সেরা স্তম্ভ সুব্রত ভট্টাচার্য। কাটিয়ে গেলেন না বলে দাপিয়ে গেলেন বলাই ভাল। এই শেষ বছরেও সুব্রত প্রমাণ করলেন, মোহনবাগানে তাঁর কোনও বিকল্প নেই। একই ক্লাবে সতেরো বছর —নেহাত কম সময় নয়। বলার মতো কাছাকাছি আছেন আর-এক ভট্টাচার্য— ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন। তিনি খেলছেন চোদ্দ বছর। তবে মনে হয় না, সুব্রতর এই একই ক্লাবে এত বছর খেলার রেকর্ড মনোরঞ্জন ভাঙতে পারবেন। এই রেকর্ডকে সম্মান জানানোর জন্যই মোহনবাগানের কর্মকর্তারা ঠিক করেছেন, ষোলো নম্বর জার্সিটি এবার থেকে আর কারও গায়েই উঠবে না।

খেলা ছাড়লেন ঠিকই, ময়দান কি ছাড়তে পারবেন সুব্রত ? মোহনবাগান ক্লাবের একনিষ্ঠ ভক্তটি জানালেন, "মোহনবাগান ছাড়ব কী করে ? খেলব না ঠিকই, এখানে আসব, বসব, এই মাঠের প্রতিটি ঘাস যে আমার চেনা।" অর্থাৎ,একেবারে মাঠ ছাড়ছেন না সুব্রত। কিছুদিনের জন্য নিজের ক্লাবের অস্থায়ী কোচ হয়েছিলেন সুব্রত। খেলা ছাড়ার পর কোচিং করানোর দিকে কি ঝুঁকবেন তিনি ? সুব্রতর বক্তব্য, "এখনও কিছু ভাবিনি। তবে বিভিন্ন ক্লাব থেকে প্রস্তাব এসেছে। এমনকী,সুদূর আন্দামানের একটি ক্লাবও আমাকে কোচ হিসেবে চায়।"

মোহনবাগানের কোচ হলে অবশ্য একটা দারুণ ব্যাপার হয়। ফুটবলার এবং কোচ এই দুইয়ে মিলে দীর্ঘদিন একই ক্লাবে যুক্ত থাকার অসাধারণ এক রেকর্ড তা হলে করে ফেলতে পারবেন সুব্রত।

সতেরো বছর মোহনবাগানে খেললেন সুব্রত। কলকাতা ময়দানে তিনি কিন্তু এসেছিলেন আরও আগে, ১৯৬৮ সালে। ১৯৬৯ সাল থেকেই খেলছেন প্রথম ডিভিশনে, প্রথম ক্লাব বালি প্রতিভা। অর্থাৎ, বাইশ বছর হয়ে গেল প্রথম ডিভিশনে খেলা। দুটি বছর বালি প্রতিভায় কাটিয়ে একাত্তর সালে এলেন বি· এন· রেল দলে। চুয়াত্তর সাল থেকে মোহনবাগানে।

শ্যামনগরের ছেলে সুব্রতর প্রথম খেলা স্থানীয় 'যুগের প্রতীক' ক্লাবে। চব্বিশ পরগনা জেলা দলের হয়ে আই· এফ· এ· শিল্ডে খেলেন। ১৯৬৮ সালে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন বড় ক্লাবের এক কর্মকর্তা। খেলা শুরু করেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। অবশ্যই জুনিয়ার দলে। হিসেবে স্বীকৃত সুব্রতর খেলা শুরু কিন্তু ফরওয়ার্ড হিসেবে। বিখ্যাত স্টপার অশোকলাল ব্যানার্জি খেলতেন যুগের প্রতীক ক্লাবে। ক্লাবের খেলায় হঠাৎ একদিন তিনি না আসায় কোচের অনুরোধে সুব্রত নামেন ডিফেন্সে। সেই শুরু। তারপর বছরের পর বছর ক্লাবের দুর্গ রক্ষার প্রধান সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন তিনি। হেরেছেন কখনও-কখনও, কিন্তু মাথা নিচু করেননি, পরের খেলাতেই রুখে দাঁড়িয়েছেন। দলের প্রয়োজনে সব পজিশনে খেলেছেন সুব্রত। এমনকী,ফরওয়ার্ড হিসেবে গোলও করে এসেছেন। তাঁর গোলের সংখ্যা ৫৮। এর মধ্যে ১১টি পেনাল্টি থেকে। ডিফেন্ডার হিসেবে এদেশে সবচেয়ে বেশি। এবারের লিগেও বড় দুই ক্লাবকে গোল দিয়েছেন। লিগ জয়ে তাঁর কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি। ক্লাবের স্বার্থেই হয়তো সুব্রত মাঝে-মাঝে অবাঞ্ছিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। অপমানিত হয়েছেন, বহুবার তাঁকে শাস্তি

ময়দানের বর্ণময় চরিত্র সুব্রত — ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

আরও একটা মজার ব্যাপার, ১৯৭৪-এ সুব্রত মোহনবাগানে গেলেও, ইস্টবেঙ্গলেই তাঁর খেলার কথা ছিল। পাকাপাকি কথাও হয়ে গিয়েছিল। মোহনবাগানের কর্মকর্তারা তৎপর হয়ে সুব্রতকে দলে টেনে নেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। যদি ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা আরও একটু সতর্ক থাকতেন, তা হলে হয়তো সুব্রতর মোহনবাগানে যাওয়াই হত না।

গত দু' দশকে ভারতের অন্যতম সেরা স্টপার পেতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলতে হবে সুব্রতর নিষ্ঠা, অনুশীলন ও ক্লাবপ্রীতির কোনও তুলনা নেই। ৩৮ বছর বয়সেও সুব্রত ক্লাবের পক্ষে এখনও সমান সম্মান পাচ্ছেন। 'রজার মিল্লা' নামে পরিচিত সুব্রতকে টেক্কা দিতে পারলেন না তরুণ ফুটবলাররা। তাঁকে দল থেকে সরাতে হল না, তিনি নিজেই সরে গেলেন শেষ বছরেও দক্ষতার চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়ে। দর্শকদের প্রিয় বাবলু লিগ ছেড়ে দেওয়ায় ময়দান এক বর্ণময় চরিত্র হারাল।

দশ বছরেই

এবারের বেজিং এশিয়াডে খুব একটা সাফল্য পায়নি ছোট্ট দেশ ইয়েমেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা টেক্কা দিয়েছে সর্বাধিক পদকজয়ী চিনকেও। এবারের এশিয়ান গেমসের কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী তাদের দেশের। নাম, মহম্মদ আল খাব্বাশ। বয়স মাত্র দশ। খাব্বাশ আবার ইয়েমেনের টেবিল টেনিস দলের দ্বিতীয় বাছাই। খাব্বাশের বাবা ব্যবসা করেন। ছ' বছর বয়সেই বাবার উৎসাহে খাব্বাশ টেনিস ব্যাট হাতে প্র্যাকটিস শুরু করে। এবং অন্যরা ভাল করে ব্যাট ধরার আগেই খাব্বাশ খেলে গেল এশিয়ার সেরা প্রতিযোগিতায়।

দুই তারকা

দু'জনেই তারকা— একজন টেনিসে, অন্যজন মোটরকার রেসিং-এ। টেনিস স্টার বরিস বেকারের ইচ্ছে, তাঁর বয়স যখন ষাট বছর হবে, তখন তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসবেন। তাতে থাকবে তাঁর দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ক্ষোভের কথা। থাকবে যাঁদের কাছ থেকে নানা আঘাত

পেয়েছেন তাঁদের কথাও। ষাটের আগে এই বই নয় কেন ? বেকারের উত্তর, "যাঁদের কথা বলব, এখন শুনলে তাঁরা প্রচণ্ড খেপে যাবেন, তাই !" মোটরকার রেসিংয়ের প্রবাদপুরুষ আয়ারটন সেনা আবার খেলা ছাড়ার পর বাইবেল শেখাতে চান। তাঁর কথা, "আমি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি বাইবেলের মধ্যে। আশা করব, অন্যরাও তা পাবেন।"

জুড়ি-বদল

স্টেফি গ্রাফ আর গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনির দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব কি ভাঙতে চলেছে ? স্টেফি আর সাবাতিনি অনেকদিনের ডাবলস জুড়ি। অনেক ট্রোফিও জিতেছেন দু'জনে। কিন্তু হঠাৎই দু'জনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর তাঁরা একসঙ্গে খেলবেন না। কারণ হিসেবে সাবাতিনি জানিয়েছেন, "গ্রাফের সঙ্গে খেললে অনেক টুর্নামেন্ট খেলা যায় না। ওর সময় হয় না। অথচ আমি আরও খেলতে চাই। এইজন্যই আমি এমন একজনকে বেছেছি যে, আমার সঙ্গে অনেক ম্যাচ খেলতে পারবে।" সাবাতিনির নতুন জুড়ি হলেন নিজের দেশ আর্জেন্টিনারই মার্সিডিজ পাজ। গ্রাফ বেছে নিয়েছেন লোরি ম্যাকনেইলকে। দেখা যাক, কোন নতুন জুড়ি শেষপর্যন্ত সাফল্য পায় !

আটলান্টায় ওলিম্পিক

স্বাভাবিক নিয়মেই চার বছর অন্তর অন্তর এক-একটি দেশ ওলিম্পিক অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব পায়। যেমন, ১৯৯২ সালের দায়িত্ব পেয়েছে বার্সিলোনা শহর। কিন্তু এর পরের অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ওলিম্পিক কোথায় হবে— এই নিয়ে যেরকম লড়াই হল কয়েকটি দেশের মধ্যে, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। এর একটি কারণও অবশ্য আছে। আসলে '৯৬ সালে ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের শতবর্ষপূর্তি হচ্ছে। সব দেশই চায় শতবর্ষের অনুষ্ঠানটি নিজের দেশে করতে। আয়োজক হিসেবে প্রধান দাবিদার ছিল আথেন্স। প্রথম ওলিম্পিক হয়েছিল ওই আথেন্স শহরেই। আরও প্রধান পাঁচ দাবিদারের অন্যতম ছিল বেলগ্রেড, মেলবোর্ন, টরন্টো ও আটলান্টা। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশের অন্যতম আধুনিক শহর আটলান্টাই অবশ্য এই দায়িত্ব পায়। এই খবর শুনে আটলান্টাবাসীরা আনন্দে সারারাত নাচগানের আসর বসিয়ে দেয়।

এখন রোবট

ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনায় সবার আগে স্থান পাবে অস্ট্রেলিয়ার নাম। যেমন সুন্দর ব্যবস্থা মাঠের, তেমনই খেলা দেখানোয় অত্যাধুনিক কায়দার প্রবর্তন করে সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়ার টিভি। এ-বিষয়ে চ্যানেল-৯ এবং ৭-এর কোনও তুলনা নেই। এবার একটি নতুন ব্যবস্থার চল হতে যাচ্ছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে। সেখানে মাঠে ঢোকার মুখে কোনও গেট থাকবে না, থাকবে একটি রোবট। একটি প্লাস্টিক কার্ড দেখালেই গেট খুলে যাবে এবং মাঠে ঢোকা যাবে। এর ফলে কার্ড দেখালেই অহেতুক হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবেন দর্শকরা।

ক্যাপ্রিয়তি

সবে পেশাদার টেনিস-জীবন শুরু করেছেন চোদ্দ বছরের জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি। ইতিমধ্যেই সার্কিটে

হইচই তো ফেলেছেনই, লক্ষ-লক্ষ টাকা রোজগারও করেছেন। দিন কয়েক আগে ফ্লোরিডার বোকা রেটনের স্কুলে গিয়েছিলেন ক্যাপ্রিয়তি। ক্লাস নাইনে পড়েন তিনি। স্কুলের সহপাঠীরা ভিড় করে দেখতে এসেছিল তাদের লক্ষপতি বন্ধুকে। ক্যাপ্রিয়তি অবশ্য ক'দিন স্কুলে যেতে পারবেন সন্দেহ আছে। বেশ কয়েকটি বড় কম্পানি তাঁকে দিয়ে টিভিতে বিজ্ঞাপন করানোর কথা ভাবছেন। খেলা ছাড়া এতেই এখন তাঁর সময় যাবে। বেজায় খুশি ক্যাপ্রিয়তি। বলেছেন, "ভালই হবে। স্কুলটুল আমার ভাল লাগে না।"

একটি খেলায় খারাপ খেলেছে বলে টাবি মর্টনকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সবাই রয়কে চাপ দিচ্ছে। তুষারঝড়ে খেলাটি যখন পরিত্যক্ত হয়, রোভার্স তখন এক গোলে হারছিল। টেলিভিশনে খেলার অনুষ্ঠানে রয় তার সমালোচকদের জবাব দিচ্ছে···
রয়, প্রায় সবজাতীয় সংবাদপত্রই বলছে টাইনকাস্টারের বিরুদ্ধে টাবি মর্টন জঘন্য খেলেছে···
ওই রিপোর্টারদের মাঠে নেমে দেখা উচিত ছিল। বলা হচ্ছে গোলের মুখে টাবি বল ফেলে দিয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ঘটনাটা দেখা যাক···
TV
রোভার্সের রয়
···ক্যামেরা যা দেখাচ্ছে না তা হল ও বল ধরতে লাফালে টাইনকাস্টারের ফরওয়ার্ড ওকে ফাউল করে···
ওকে ইচ্ছে করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে আমরা বিপদ কাটাই, কিন্তু আমাদের ফ্রি-কিক পাওয়া উচিত ছিল।
অবশিষ্ট খেলাটা সম্পর্কে বলতে পারি যে, বিরাট অভিজ্ঞতা দিয়ে টাবি অত্যন্ত খারাপ একটা অবস্থা সামাল দিয়েছে।
মোদ্দা কথা, টাইনকাস্টারের সঙ্গে খেলাটা দিয়ে টাবিকে বিচার করে ওকে দল থেকে বাদ দেওয়া অন্যায়···আর আমি ছাড়া কেউ তা বুঝছে না।
তাই! এবার বোধ হয় আসল কথাটা বুঝতে পারছি, রয়···
···সম্ভবত তোমার সঙ্গে কারও মতের মিল হচ্ছে না বলেই তুমি টাবিকে বাদ না দেওয়ার জিদ ধরেছ!
শোনো, তৈরি হওয়ার সময় না দিলেও আমি অনুগ্রহ করে এসেছি···
···আর বদলে পাচ্ছি শুধু বক্তৃতা! দর্শকদের কাছে মাফ চেয়ে আমি যাচ্ছি। আমার ঘাড়ে একটা দলের দায়িত্ব!
কিন্তু রয়! আ-মি-

(এর পরে আগামী সংখ্যায়) □

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

উসিরো গেরি

কয়েকটি সংখ্যায় আমি কিওকুশিন ক্যারাটের পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি। আগেই বলেছি, ক্যারাটে কথার অর্থ খালি হাতে আত্মরক্ষার পদ্ধতি। কিন্তু শুধু খালি হাতের সাহায্যেই নয়,শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই প্রতিপক্ষের আঘাত আটকানো এবং আঘাত করার কাজে লাগে। এর মধ্যে পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু হাতের থেকে পায়ের জোর অনেক বেশি, সেইজন্য পায়ের আঘাতে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে বিশেষ সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। পা দিয়ে আঘাত করার এক-একটি পদ্ধতিতে পায়ের এক-একটি অংশ আঘাত হানার কাজে লাগে। এই সংখ্যায় আমি পা দিয়ে আঘাত করার যে কৌশল নিয়ে আলোচনা করব তার জাপানি নাম 'উসিরো গেরি'।

উসিরো গেরি : এই কথাটির ইংরেজি অর্থ হল 'ব্যাক কিক', বাংলায় বলা যেতে পারে নিজের পেছন দিকে পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল। আগেই বলেছি যে, পা দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতিগুলো সাধারণত ইওইদাচি থেকে অনুশীলন করা হয়। সেইমতো ঠিকভাবে ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে, তারপর হাত দুটো মুঠো করে নীচ থেকে ওপরে তুলে এনে কানের উচ্চতায় মুখের সামনে দু'দিকে ঠিকভাবে মুখটাকে ঢেকে দাঁড়াতে হবে, যাতে সহজে প্রতিপক্ষ মুখ লক্ষ্য করে আঘাত করতে না পারে। এইবার প্রথমে ডান পা-টা হাঁটু থেকে মুড়ে মাটি থেকে তুলতে হবে। শরীরের সব ওজন তখন বাঁ পায়ের ওপর রাখতে হবে। ডান পায়ের পাতা ভেতর দিকে টেনে গোড়ালির অংশ বাইরের দিকে বের করে রাখতে হবে। এইবার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দেখে নিতে হবে। তারপর ডান পা পেছনদিকে ছুঁড়তে হবে। সেইসঙ্গে শরীরের ওপর ভাগ সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকবে শরীরের ব্যালান্স বা ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য। ডান হাত ওপর থেকে নেমে এসে গ্রইন-এর অংশ আড়াল করে রাখতে হবে। ডান পা পেছনে ছোঁড়ার সময় ডান পায়ের নীচের অংশের একবারে পেছনের অংশ (গোড়ালি) দিয়ে আঘাত করতে হবে। এই উসিরো গেরি অভ্যাস করার সময় যদি পাশ থেকে দেখা হয় তবে ঠিক অনেকটা ইংরেজি 'Y' অক্ষরের মতো লাগবে। ডান পা ছোঁড়ার সময় বাঁ পায়ের হাঁটু একটু মুড়ে বাঁ পা মাটিতে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। এইভাবে ডান পা দিয়ে পেছনে আঘাত করা হলে ডান পা আবার হাঁটু থেকে মুড়ে প্রথম অবস্থায় মাটিতে ফিরে আসবে। এর পর সব ব্যাপার ঠিক রেখে বাঁ পা পেছনদিকে ছুঁড়তে হবে। তারপর আবার ডান তারপর বাঁ পা, এইভাবে প্রতি পায়ে প্রথমদিকে ১৫-২০ বার করে, তারপর আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে প্রতি পায়ে ৫০ বার করে অনুশীলন করতে হবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে পা পেছনে ছোঁড়ার সময় কোমর পেছনদিকে ঘুরে না যায় এবং হাঁটুতে ঝটকা না লাগে।

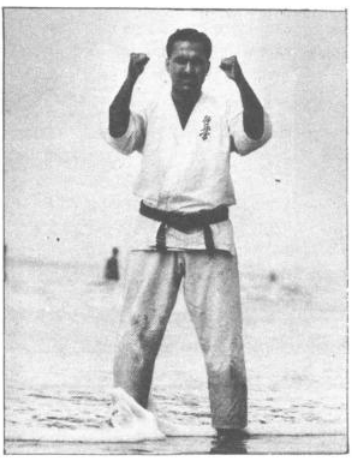

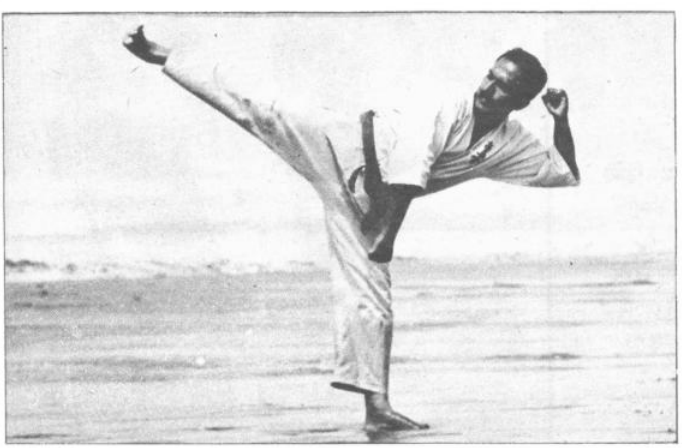

ফোটো : উৎপল সরকার

কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে স্টেফি

মহিলাদের টেনিসে স্টেফি গ্রাফের আধিপত্যের দিন কি শেষ হতে চলেছে ? আলোচনা করেছেন প্রবীর বসু

কিছুদিন আগেও ব্যাপারটা ছিল অসম্ভব। টেনিসের প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছিলেন স্টেফি গ্রাফ। গত দু-তিন বছর তাঁর জেতাটা কোনও খবর হিসেবেই গণ্য হত না, হঠাৎ কোনও ম্যাচে হেরে গেলে সেটাই ছিল খবর। বর্তমানে স্টেফি যে সাম্রাজ্য হারিয়েছেন তা নয়, তিন বছরের ওপর তিনিই বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। কিন্তু স্টেফি যে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে আরও কঠিনতর পরীক্ষার সামনে ফেলার জন্য একদল তরুণী যে তৈরি, সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিছুদিন আগেও আর্জেন্টিনার সুন্দরী তরুণী গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি স্টেফি। আনার কারণও ছিল না। গত ২১টি পারস্পরিক ম্যাচে সাবাতিনি জিততে পেরেছিলেন মাত্র ৩টিতে। জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নে সাবাতিনির খেলা দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন একদিন স্টেফি আর সাবাতিনিই টেনিস দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করবেন, যেমন করেছিলেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা আর ক্রিস এভার্ট কিছুদিন আগেও, তাঁরাও হতাশ হতে লাগলেন সাবাতিনির ক্রমে পিছিয়ে পড়া ফর্ম দেখে। অথচ দর্শক এবং অর্থ দুইই পাচ্ছিলেন সাবাতিনি। তা সত্ত্বেও তো দূরের ব্যাপার, দু' নম্বর স্থানটিও নিজের দখলে আনতে পারেননি সাবাতিনি। কিছুদিন আগেও ফ্রেঞ্চ ওপেনে হেরেছেন চতুর্থ রাউন্ডে অনামী একজনের কাছে।

সেই সাবাতিনিই কিন্তু সম্প্রতি সম্পূর্ণ অন্য চেহারায় এসে হাজির হয়েছেন। কোচ বদল করে, গ্রাউন্ড স্ট্রোকে উন্নতি ঘটিয়ে, প্রভূত পরিশ্রমে নিজেকে মেজেঘষে সাবাতিনি এখন অনেক পরিণত। স্টেফিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে হারিয়ে দিলেন স্টেফিকে। এবং এই প্রথমবার স্টেফির বিপক্ষে জিতলেন ম্যাচকে তৃতীয় সেট অবধি না গড়াতে দিয়ে। আর্জেন্টিনার প্রথম ইউ· এস· ওপেন বিজয়ী মহিলা খেলোয়াড়ও হলেন সাবাতিনি।

সাবাতিনি বয়সে স্টেফির থেকে এক বছরের ছোট, তাঁর বয়স এখন কুড়ি। এই প্রথম তিনি গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট জিতলেন। সাবাতিনি বলেছেন, "আমি প্রমাণ করবই, দক্ষতায় কারও চেয়ে কম নই। এই যুগটা একা স্টেফির নয়, তা আমি দেখাব। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয় দিয়ে সেটা শুরু হল মাত্র।"

সাবাতিনির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সতেরো বছরের তরুণী মোনিকা সেলেস। শীর্ণকায়া সেলেস যুগোস্লাভিয়ার মেয়ে, এখন থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়। ১৯৮৮-তেও বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তাঁর স্থান ছিল ৮৮ নম্বরে, এখন প্রথম পাঁচজনের মধ্যে তাঁর নাম। দ্বিতীয় স্টেফি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন মোনিকা। ক্রিস এভার্টকে হারিয়ে পেশাদার টেনিস-জীবন শুরু করেন মোনিকা। দু' হাতে

গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি

উ এস ওপেন জিতে সাবাতিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, এবার থেকে স্টেফির সামনে তিনিই বড় চ্যালেঞ্জ। জনপ্রিয়তার বিচারে অবশ্য স্টেফির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে এসেছেন সাবাতিনি। আর্জেন্টিনায় মারাদোনার মতোই তিনি জনপ্রিয়। প্রেসিডেন্ট কারলস মেনেম সাবাতিনিকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় কথাটা নিজেই স্বীকার করেছেন।

জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি

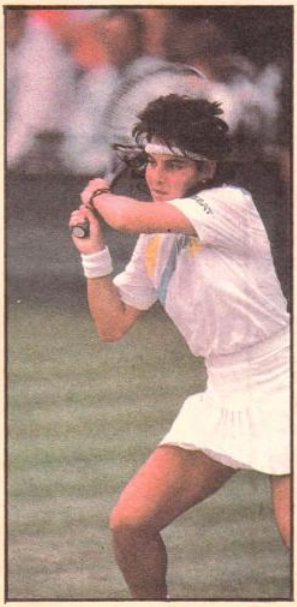

আরান্থা স্যানচেজ

মোনিকা সেলেস

প্রচণ্ড জোরে মারতে পটু সেলেস, ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকে দারুণ পোক্ত। স্টেফিকে হারিয়ে কোনও টুর্নামেন্ট এখনও জিততে পারেননি ঠিকই, কিন্তু প্রায়ই বেগ দেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস-স্টারকে। স্টেফি নিজেও সেটা স্বীকার করে বলেছেন, "নতুনদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে প্রতিভাময়ী। এখন যে-কোনওদিন আমাকে হারাতে পারে।" সেলেস নিজেও সেটা জানেন, তাই শুধু একবার-দু'বার হারানো নয়, তাঁর লক্ষ্য এখন স্টেফির এক নম্বর আসনটি দখল। যে ফর্মে আছেন সেলেস, লক্ষ্যটা অসম্ভব কিছু নয়।

হইহই করে টেনিস সার্কিটে প্রবেশ করেছেন আর-এক তরুণী জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি। তরুণী না বলে কিশোরী বলাই ভাল। আমেরিকার এই চোদ্দ বছরের মেয়েটিকে বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই নব্বই দশকের সুপারস্টার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর খেলায় একদিকে যেমন আছে প্রতিভা, অন্যদিকে শক্তি। মাঠ জুড়ে খেলেন, দুর্বলতা নেই বললেই চলে। আর-একটু অভিজ্ঞতা বাড়লে ক্যাপ্রিয়তিকে রোখা মুশকিল হবে অনেকের। কারণ খেলা শুরু করতে-না-করতেই এই কিশোরী ইতিমধ্যেই

স্টেফি গ্রাফ

ত্রাহি-ত্রাহি রব ফেলে দিয়েছেন টেনিস সার্কিটে। এই ঝড় বোধ হয় আটকাতে পারবেন না স্টেফি গ্রাফও।

গতবারের ফ্রেঞ্চ ওপেন বিজয়ী আঠারো বছরের আরান্থা স্যানচেজও শক্তিশালী খেলোয়াড়। বার্সিলোনার এই তরুণীর স্থান এখন বিশ্বের প্রথম দশজনের মধ্যে।

যে-কোনওদিন যে-কোনও অঘটন ঘটানোর ক্ষমতা ধরেন স্যানচেজ। তাঁকে সমীহ করেন প্রায় সকলেই। নিজের ওপর আস্থা বাড়াতে পারলে স্যানচেজও স্টেফিকে তাঁর জায়গা থেকে হয়তো সরিয়ে দিতে পারবেন।

টেনিস সার্কিটে দ্রুত উঠে আসছেন আরও অনেকে। ১৫ থেকে ২০ বছরের এই তরুণীদের মধ্যে আছেন মেরি জো ফার্নান্ডেজ, লিন্ডা ফার্নান্ডো সহ অনেকেই। এঁরা যথেষ্ট পেশাদার, মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী এবং বিভিন্ন আকাদেমিতে ট্রেনিং পেয়ে একেবারে তৈরি।

এখন পর্যন্ত ন'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টে জয়ী হয়েছেন স্টেফি গ্রাফ। তিনিই বিশ্বে এক নম্বর। কিন্তু যেভাবে উঠে আসছেন সেলেস, ক্যাপ্রিয়তিরা, তাতে স্টেফির সামনে যে কঠিন সময় আসছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

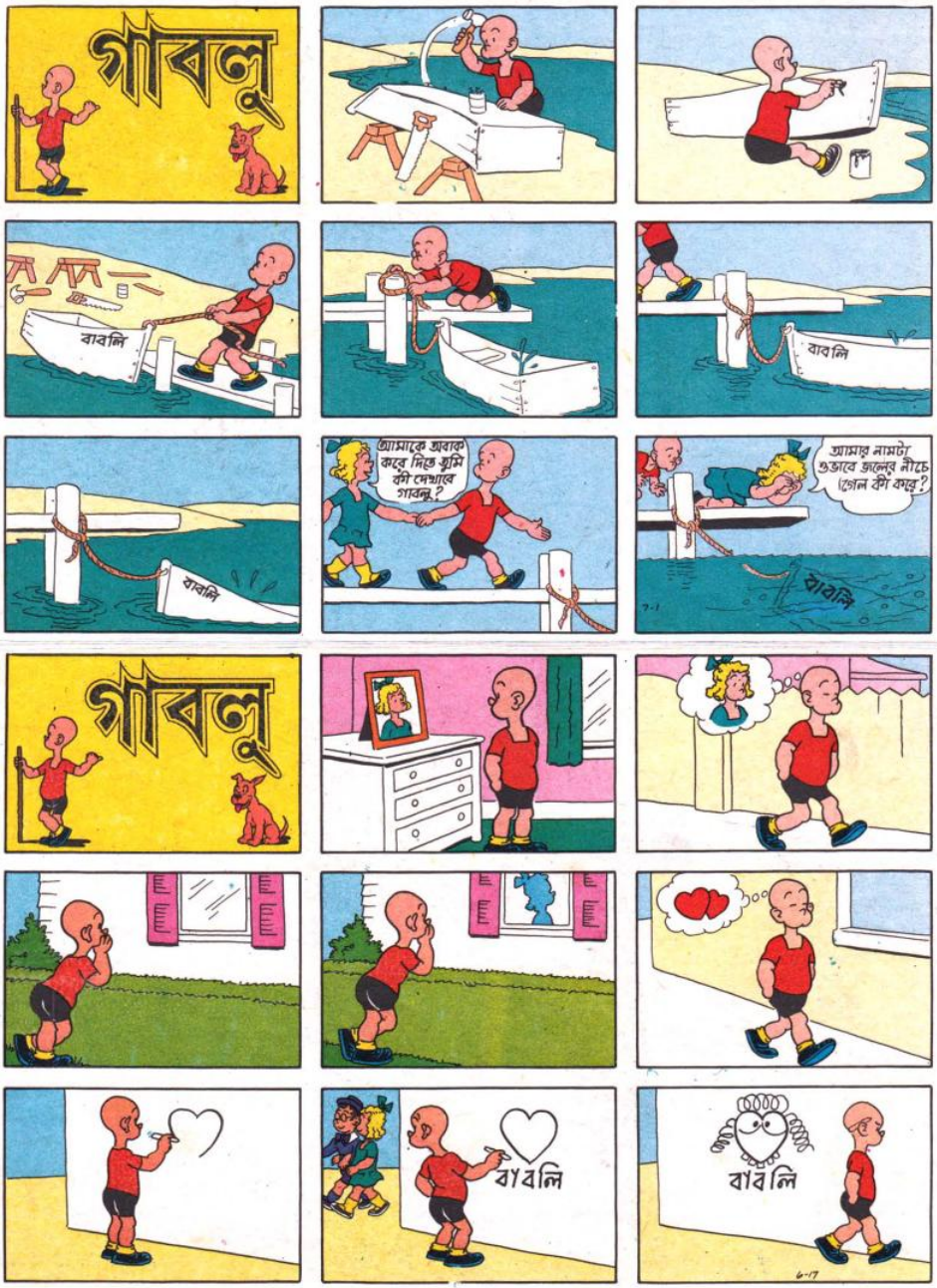
গাবলু
বাবলি
বাবলি
আমাকে অবাক করে দিতে তুমি কী দেখাবে গাবলু?
আমার নামটা শুভাবে জলের নীচে গেল কী করে?
বাবলি
গাবলু
বাবলি
বাবলি

ক্যাম্পাস

হীরক-জয়ন্তী উৎসব

সম্প্রতি ন' দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতার মর্ডান স্কুলের হীরক-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক- কর্মীবৃন্দের সঙ্গে উৎসাহভরে যোগ দিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রেরা, খেলাধুলো ও শিল্প- সংস্কৃতি-জগতের বিভিন্ন কৃতী ব্যক্তিত্ব এবং কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

বিদ্যালয়ের স্কাউট ও কোরের সদস্যেরা অভিনয় করে সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটি। খুদে শিল্পীদের অভিনয়ে নাটকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রদের অভিনয়ে 'রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা'

বা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রদের নাটক 'চারমূর্তি'ও হয়ে উঠেছিল বিশেষ উপভোগ্য। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় মডার্ন স্কুলের তুষার রায় পেয়েছে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মান পেয়েছে জীব-শিব মিশন কিরণচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের নাটক এবং শ্রেষ্ঠ প্রযোজক নির্বাচিত হয়েছে ওই স্কুলের রীতা মৈত্র।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে সৌরীশ দাশগুপ্ত (শরৎচন্দ্র সুর ইনস্টিটিউশন,) সুমিত চক্রবর্তী, অরিজিৎ ভট্টাচার্য (মডার্ন স্কুল), লালটি দত্ত, ধৃতিশ্রী চন্দ (হোলি চাইল্ড স্কুল), শেখ মৈনুজামান (মডার্ন স্কুল), অর্ণব চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম ঘোষ (রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেনশিয়াল কলেজ), সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় (বেলতলা গার্লস হাই স্কুল) প্রমুখ ছাত্রছাত্রী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

কণ্ঠসঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শুভেন্দ্র চক্রবর্তী (যাদবপুর বিদ্যাপীঠ), কৌশিক ভট্টাচার্য (মডার্ন স্কুল), উর্মিলা গর্গ (আওয়ার লেডি কুইন অব দ্য মিশন স্কুল), সানলিয়া ডোরেস (হোলি চাইল্ড), অদিতি দত্ত (মুরলিধর স্কুল ফর গার্লস), অঞ্জন মুখোপাধ্যায় (ঢাকুরিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাপীঠ), গৌতম বসু, নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য (যাদবপুর বিদ্যাপীঠ), দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (বেলতলা গার্লস হাই স্কুল) বিভিন্ন বিভাগের সফল প্রতিযোগী।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মডার্ন স্কুলের সৌম্য দশগুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি চন্দ ও রথীন দাসের বক্তব্য এবং বাচনভঙ্গি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতাটি ছিল সব অর্থেই উজ্জ্বল। ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি, রঙের ব্যবহার, উপস্থাপনায় ও ব্যাপক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল রঙিন। বিজ্ঞানেও যে ছেলেরা কত আগ্রহী তার প্রমাণ ছড়িয়ে ছিল বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে। অঙ্ক, রসায়ন, ভৌতবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, বৈদ্যুতিক ও কারিগরি বিজ্ঞানের বহুমুখী শিক্ষা তারা হাতে-কলমে ফুটিয়ে তুলেছিল নানা আকর্ষক মডেল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে।

একটি বিদ্যালয়ের ষাট বছর বয়স হওয়াই বড় কথা নয়, বৃহত্তর ক্ষেত্রেও যে ছাত্রেরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠছে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে হয়ে উঠেছে বহুমুখী, এখানেই মডার্ন স্কুলের হীরক-জয়ন্তী উৎসবের সার্থকতা।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

কলকাতার জন্মদিনে

কলকাতার তিনশো বছর পূর্ণ হল ২৪ অগস্ট। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রেস ক্লাব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দরবার হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান। অধ্যাপক হাসান তাঁর ভাষণে বলেন, "কলকাতা সারা ভারতের গর্ব। এ-শহর শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশেরই সাংস্কৃতিক হৃদয়।" রাজ্যপাল এই অনুষ্ঠানে কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে প্রকাশিত পঞ্চাশজন বিশিষ্ট নাগরিকদের লেখা নিয়ে 'আমার কলকাতা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে লেডি রাণু মুখার্জি, মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি মেয়র মণি সান্যাল, সাহিত্যিক শংকর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর ডঃ হীরেন চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল নৃত্যানুষ্ঠান। পরিবেশন করেন আনন্দশঙ্কর-তনুশ্রীশঙ্কর ও সম্প্রদায়। পরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রোতাদের পছন্দমতো কয়েকখানি পুরাতনী গান পরিবেশন করেন। পরে অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর পরিচালনায় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অংশ নিয়েছিলেন সবিতা চৌধুরী, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, সৈকত মিত্র এবং 'ক্যালকাটা কয়্যার'-এর সভ্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পঙ্কজ সাহা। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

কাজল চক্রবর্তী

কেরিয়ার গাইড

জি· বি· পন্থ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি

আমাদের দেশে কৃষি এবং প্রযুক্তির বিষয়ে পড়াশোনার জন্য যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আছে উত্তরপ্রদেশের পন্থনগরের গোবিন্দবল্লভ পন্থ কৃষি এবং প্রৌদ্যোগিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকচিহ্ন (সিম্বল) ভালভাবে লক্ষ করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠক্রম এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। এই প্রতীকচিহ্নে আছে লাঙল, গোরুর গাড়ি, গোরু, সাপ, মাইক্রোস্কোপ, গিয়ার, দাঁড়িপাল্লা, তীর-ধনুক ইত্যাদির চিহ্ন। লাঙল কৃষির, গোরু গৃহপালিত পশুর, সাপ চিকিৎসাবিজ্ঞানের, মাইক্রোস্কোপ বিজ্ঞানের, গিয়ার প্রযুক্তির, দাঁড়িপাল্লা ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটো হিসেবে লেখা আছে : গ্রামের ঐশ্বর্যই দেশের ঐশ্বর্য। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ শিক্ষাক্রমের একটা মূল উদ্দেশ্য।

কী বিষয় পড়ানো হয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পাঠক্রমের মধ্যে ব্যাচেলর অব সায়েন্স, এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবান্ড্রি, ব্যাচেলর অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবান্ড্রি, ব্যাচেলর অব ফিশারিজ সায়েন্স, ব্যাচেলর অব হোম সায়েন্স পাঠক্রমের নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, এগ্রিকালচারাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, প্রোডাকশন এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি পাঠক্রমও পড়ানো হয়।

উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল জেলার পন্থনগরে গোবিন্দবল্লভ পন্থ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি আজ এক বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি সম্পর্কিত নানা পাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য হল :

(১) কৃষিবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নানা পাঠক্রমে গবেষণার সুযোগ আছে।

(২) কমন এনট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

(৩) সবচেয়ে বড় সুযোগ হল, উচ্চ মাধ্যমিকে নির্দিষ্টসংখ্যক নম্বর পেয়ে পাশ করার কড়াকড়ি নেই ; বিজ্ঞান বা কৃষি শাখায় পাশ করলেই পরীক্ষায় বসা যেতে পারে।

(৪) কৃষিবিজ্ঞান, পশুপালন, পশুচিকিৎসা, পশুসংরক্ষণ, মৎস্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ আছে।

এনট্রান্স পরীক্ষার বিষয়

সাধারণত বিভিন্ন কোর্সে অর্থাৎ বি· এসসি· এগ্রিকালচার অ্যানিমাল হাজবান্ড্রি, ফিশারিজ সায়েন্স প্রভৃতি কোর্সে ভর্তির জন্য কমন এনট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয়। একটি পেপারে মোট দুশো নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রশ্ন থাকে মালটিপল চয়েস অবজেকটিভ ধরনের। প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যেভাবে প্রশ্ন থাকে সেটি হল মেন্টাল এবিলিটি ১০০ নম্বর, স্কলাস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট ৭৫ নম্বর, ল্যাঙ্গুয়েজ-এ ২৫ নম্বর। স্কলাস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্টে ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথমেটিকস, এগ্রিকালচার প্রতিটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকে। প্রার্থীকে তার পছন্দ অনুযায়ী তিনটি বিষয় বেছে নিতে হয় ; সেক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের ওপর ২৫ নম্বর থাকে। মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট বিষয়ে হাই স্কুল স্ট্যান্ডার্ডের প্রশ্ন থাকে। ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ের পরীক্ষা সব কোর্সের প্রার্থীর কাছেই বাধ্যতামূলক। ইংরেজি বা হিন্দি যে-কোনও একটি বেছে নিতে হয়। ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথমেটিকস ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন করা হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ পেপারের প্রশ্নের মান হাই স্কুল স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ মাধ্যমিক মানের মতো হয়।

এনট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন কোর্সের জন্য

মেরিট লিস্ট তৈরি করা হয়। সাধারণত শতকরা ৪০ শতাংশ নম্বর না পেলে মেরিট লিস্টে নাম ওঠানো হয় না। তবে তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৪ শতাংশ নম্বর পেলেই তাদের প্রার্থীপদ বিচার করা হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

সায়েন্স এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবান্ড্রি কোর্সে ভর্তি হতে হলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃষি বা বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করে থাকতে হবে। তবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ম্যাথমেটিকস অথবা বায়োলজি থাকা চাই। গ্রামীণ কর্মীদের ক্ষেত্রে এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে উচ্চ মাধ্যমিক বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃষি বা বিজ্ঞান বিভাগে ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। উপরন্তু দু' বছরের ভিলেজ লেভেল ওয়ার্কার্স ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করে থাকা চাই। এ ছাড়া গ্রামীণ ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতাও থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে এই সুযোগ কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রার্থীরা ভোগ করতে পারবে। তাদের এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে হবে না।

ভেটেরিনারি সায়েন্স কোর্সে ভর্তি হতে হলে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান শাখা নিয়ে পাশ করে থাকতে হবে। বিষয় হিসেবে বায়োলজি বা কৃষি থাকা চাই। সরকার মনোনীত কর্মীরাও এই কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে বায়োলজি সহ উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় শতকরা ৫৫ নম্বর অথবা কৃষি শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে থাকা চাই। আর-একটি শর্ত হল মাধ্যমিক পরীক্ষায় এগ্রিগেটে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করে থাকতে হবে। উপরন্তু লাইভস্টক সুপারভাইজার ডিপ্লোমা কোর্সও পাশ করে থাকা চাই। এই সুযোগ রাজ্য সরকার মনোনীত লাইভস্টক সুপারভাইজার শ্রেণীর কর্মীরা ভোগ করতে পারেন।

ফিশারিজ কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে বায়োলজি অথবা ম্যাথমেটিকস অথবা এগ্রিকালচার সহ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে।

হোম সায়েন্স কোর্সে ভর্তির জন্যও প্রার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা চাই। তবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বায়োলজি অথবা ম্যাথমেটিকস অথবা কৃষি থাকা চাই। এই কোর্সটি কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মনোনীত গ্রামসেবিকা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বা কৃষি শাখায় কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। এ ছাড়া পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং গ্রামসেবিকা ডিপ্লোমা কোর্সও তাঁদের পাশ করতে হবে। এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ফিজিকস, কেমিস্ট্রি,

ম্যাথমেটিকস অথবা এগ্রিকালচার সহ উচ্চ মাধ্যমিক বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করা চাই। সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, ইলেকট্রনিকস, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স বিষয় সহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করলেই চলবে।

বিভিন্ন কোর্সে আসনসংখ্যা

ব্যাচেলর অব সায়েন্স এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবান্ড্রি কোর্সে মোট আসনসংখ্যা ১১৩। ব্যাচেলর অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজবান্ড্রি কোর্সে আসনসংখ্যা ৫৮। ফিশারিজ সায়েন্স কোর্সে আসনসংখ্যা ১৪। হোম সায়েন্স কোর্সে আসনসংখ্যা ৫২। ব্যাচেলর অব টেকনোলজি কোর্সে মোট আসন ২১৩। এর মধ্যে এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩৫টি, সিভিল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২৫টি, ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩৫টি, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪৫টি, প্রোডাকশন এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৫টি, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৫টি, কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৫টি আসন আছে। তফসিলি প্রার্থীদের এবং সরকার মনোনীত প্রার্থীদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

ভর্তির নিয়মকানুন

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থাৎ মেধা অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ আগ্রা, এলাহাবাদ, লখনউ, কানপুর, পন্থনগর, রুরকি, বারাণসী, দিল্লি, হায়দরাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে এই লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষার মাধ্যমে বি· এসসি· এগ্রি· অ্যান্ড এ· এইচ·, বি· ভি· এসসি· অ্যান্ড এ· এইচ, বি· এসসি· হোম সায়েন্স (কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য), ব্যাচেলর অব ফিশারিজ সায়েন্স কোর্সে ভর্তি করা হয়। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি· টেক· প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তাঁদের আলাদাভাবে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে হয়। এই পরীক্ষা গৃহীত হয় কানপুরের হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে। সুতরাং বি· টেক· প্রোগ্রামের ভর্তি-সংক্রান্ত প্রসপেক্টাস, ফর্ম ইত্যাদির জন্য লিখতে হবে— কো অর্ডিনেটর, অ্যাডমিশন কমিটি, এইচ বি টি আই কানপুর-এর কাছে।

প্রতি বছর জানুয়ারি মাস নাগাদ বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে হয়। এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য ফর্ম এবং প্রসপেক্টাস কো-অর্ডিনেটর (অ্যাডমিশন) জি· বি· পন্থ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, পন্থনগর-২৬৩১৪৫, জেলা নৈনিতাল (উত্তরপ্রদেশ) ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করা যায়। তবে এজন্য অনুরোধপত্রের সঙ্গে সাত×দশ ইঞ্চি মাপের নাম-ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটযুক্ত একটি বড় খাম এবং দশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফটটি ইউনিভার্সিটির নামে কাটতে হবে এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, পন্থনগর শাখার ওপর হওয়া চাই। পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে একশো টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে হয় আবেদন ফি হিসেবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফটটি অ্যাকাউন্টপেয়ি হওয়া চাই এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অথবা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, পন্থনগর শাখার ওপর কাটতে হবে।

ছবি : দেবাশিস দেব

সম্পূর্ণ উপন্যাস

চাঁদের মাঠে ময়ান চে

সিদ্ধার্থ ঘোষ

ব্যাটটা হাতে নিয়ে আবির আপন মনে নানা ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছ' ভাগের এক ভাগ তাই ব্যাট ও বল দুটোরই ভর পাঁচগুণ বাড়িয়ে একটা সমতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। পৃথিবীতে সমুদ্রের নীচে অনুশীলনের সময়ে যতই চাঁদের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হোক, তফাত তো থাকবেই।

লুনার টিমের খেলোয়াড়রা ওদের এখন নেট প্র্যাকটিসে সাহায্য করছেন। আবির অনুভব করে যে ব্যাটটা এমনিতে একটু হালকা ঠেকলেও হঠাৎ তোলা বা ঘোরানোর সময়ে কিন্তু যেন একটা বাড়তি জোর দিতে হচ্ছে। হুক শটের মতো ব্যাটটা চালালে আবার ফলো থ্রুর সময়ে শরীরের ভারসাম্য রাখতে অসুবিধে হচ্ছে।

দয়ালের লেকচারের কথা মনে পড়ে যায়। ব্যাটের ভর বাড়ালেও বাড়তি ওজন টের পাওয়া যাবে না ঠিকই কিন্তু ইনারশিয়ার দরুন অচল অবস্থা থেকে ব্যাটটাকে নাড়ানো বা সচল ব্যাটটাকে থামানোর জন্য বাড়তি জোর লাগবে।

আবির প্রতিজ্ঞা করল আজকের মতো সে তার প্রিয় হুক শটটাকে ভুলে যাবে।

স্প্রে-গান হাতে এক লুম্যান আবিরের পোশাকের বুকে-পিঠে বড়-বড় রোমান হরফে 'চার' লিখে দিলেন। পৃথিবীর খেলোয়াড়দের জন্য নীল রং আর চাঁদের জন্য চকোলেট। স্পেস-স্যুট পরার পর কাউকে চেনা খুব শক্ত। সে খেলোয়াড়ই হোক আর দর্শক। দর্শকরাও এখন প্রত্যেকে মোটর গাড়ির মতো নাম্বার প্লেট বয়ে বেড়াচ্ছেন।

ট্রান্সমিটার বার্তা থেকে জানা গেল, খেলার মাঠে ফিল্ডিং সাইড ট্রান্সমিটারের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে এবং আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন কিন্তু ব্যাটসম্যানরা তাঁদের কথা শুনতে পাবেন না। অন্য তরফে দুই ব্যাটসম্যান নিজেদের মধ্যে ও আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

আবির হঠাৎ আবিষ্কার করল স্টেডিয়ামের এক প্রান্তে বিশাল ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডে খেলোয়াড়দের নাম ও নাম্বার ইত্যাদি জ্বলজ্বল করছে। একটু আগেও ওটা ছিল না। হলোগ্রাফিক প্রোজেকশনের কারসাজি—বিনা পরদায় শূন্যের ওপর ছবি ফুটিয়ে তোলা।

সুইং ব্যাপারটা অচল জেনেও ওয়েসলি গিলক্রিস্ট তাঁর অভ্যাসকে ছাড়তে রাজি নন। থাইয়ের ওপর বল ঘসতে-ঘসতে আঠারোটা স্টেপ নিচ্ছেন। দয়ালের সব পদার্থবিদ্যা নাকচ করে তিনি টিমে ঢুকেছেন। রান আপও কমাননি। গিলক্রিস্টের চেয়ে দ্রুতগতি আরও তিনজন পৃথিবীর বোলারকে সরিয়ে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও সাবলীল বোলিং অ্যাকশনের জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। আবিরের বদ্ধমূল ধারণা, আজ ওঁর পারফরম্যান্সের ওপর খেলার ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করবে।

সন্তর্পণে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করেন গিলক্রিস্ট। গোড়ালি ঠুকে-ঠুকে। তারপর ছোট-ছোট লাফ মারতে-মারতে। শরীরটা এবার কাত করে নিয়েছেন, বুকটা ব্যাটসম্যানের দিক থেকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেছে। মাটি ছেড়ে তিন ফুট, চার ফুট, প্রায় পাঁচ ফুট ওপরে লাফিয়ে উঠেছেন গিলক্রিস্ট। বোলিং ক্রিজে থপ করে পড়ার সময়ে শরীরটায় অদ্ভুত একটা মোচড় দিয়ে বলটা ছেড়ে দিলেন।

গুড লেংথেই পিচ খেয়েছিল, কিন্তু বলটা ব্যাটসম্যানের মাথার প্রায় ছ' ফুট ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। উইকেটকিপার বলটা ধরার চেষ্টায় লাফ মারতেই বলটার চেয়ে প্রায় তিন ফুট ওপরে উঠে গেল। এরকম কিপিং করলে কত বাই যে দেবে!

গিলক্রিস্ট বল ডেলিভারি করার পর টাল সামলাতে উলটো দিকের উইকেট পেরিয়ে গেছেন। আর-এক সমস্যা। এভাবে ফাস্ট বোলারদের প্রত্যেক ওভার শেষ করতে দেড়গুণ সময় লাগবে।

মাইক্রোফোন সতর্ক করে দিল যে, ব্যাটসম্যানের মাথার ওপর দিয়ে বল বেরিয়ে গেলে 'ওয়াইড' ঘোষিত হবে।

ফিল্ডিংয়েও বেশ অসুবিধে হচ্ছে। গিলক্রিস্টের একটা বল ড্রাইভ করল আবির। শিউলালের একফুট ডান দিক দিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শিউলাল অভ্যাসবশত দ্রুত দিক পরিবর্তন করার চেষ্টা করামাত্র স্লিপ করে পড়লেন।

নেট প্র্যাকটিসে নিজেদের টিমের অবস্থা দেখে দর্শক মহলে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ জমেছে। এত রিস্ক ঘাড়ে নিয়ে, এত টাকা খরচ করে এই খেলা দেখতে আসাটা বোধ হয় বোকামি হয়েছে। এতদিন ধরে তা হলে কী প্র্যাকটিস করল! শেষে না লুম্যানদের হাসির খোরাক হয়। ওয়ান সাইডেড ম্যাচ যে হবে তাতে তো কোনও সন্দেহই নেই।

টাইম আপ! খেলোয়াড়রা ফিরে যান প্যাভিলিয়নে। টস হবে। অতিথি টিমের ক্যাপ্টেন ওরিলিকেই কয়েন ছুঁড়তে অনুরোধ করা হয়েছে। বুড়ো অঙুলের ডগা থেকে মুদ্রাটা ছিটকে যাওয়ামাত্র আবার বোঝা গেল যে, অজস্র বক্তৃতা গেলানো ও পাখি-পড়া করে শেখানোর পরেও চাঁদের দেশের নিয়ম মেনে চলা বড় সহজ হবে না। কয়েনটা কত তলা বাড়ির ছাদ পেরিয়ে উঠেছিল বলা শক্ত। নামছে তো নামছেই।

লুনার ইলেভেনের ক্যাপ্টেন (এক নম্বর) হাত উঁচু করে জানিয়ে দিলেন, টসে তাঁরা জিতেছেন। ওয়ার্ল্ড ইলেভেনকে তাঁরা প্রথম ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এর উলটোটা হলেই খুশি হত আবির।

॥ ১০ ॥

টাকাটা পুরো জলে গেল। ভাবছিলেন পার্থ। যে জন্য আসা তার বোধ হয় কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রচণ্ড কড়াকড়ি। দর্শকদের বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে বসানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্লকে একজন করে অফিসার-ইন-চার্জ। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। শারীরিক কোনও অস্বস্তি হলে তাঁরাই ব্যবস্থা করবেন মেডিক্যাল সেন্টারে পাঠাবার।

সবচেয়ে বড় কথা লুম্যানদের সংস্পর্শে আসার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। এমনকী, তাঁদের কীরকম দেখতে সেটা অবধি জানা সম্ভব নয়। স্পেস-স্যুটের আবরণ দুর্ভেদ্য।

পার্থদের ব্লক থেকে তিন দর্শককে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ ইতিমধ্যেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন মহাকাশ তরীতে। তারা নাকি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে লুম্যানদের কাছে গোপন বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করছিল।

গ্যালারি ছেড়ে একবার উঠেছিলেন পার্থ। পেছনের অংশে স্ন্যাক্স ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। চাঁদের কোনও সামগ্রী নেই সেখানে। সবই পৃথিবীর ক্যাটারাররা বয়ে এনেছে। তবে কেনাকাটার চেয়ে দেখবার লোকই বেশি। আর বাড়তি আকর্ষণের মধ্যে স্পেস-স্যুটের মাথার অংশটা খুলে ফেলার সুযোগ। কারণ এটা বায়ুনিরোধক কামরা। স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো যায়।

সবচেয়ে বেশি ভিড় স্মোকিং রুমে। লাইন পড়ে গেছে গোটা দশেক খুপরির প্রত্যেকটার সামনে। শুধু সিগারেট কেনা নয়, সেকেন্ডের হিসেবে অক্সিজেন পোড়ানোর জন্য অগ্রিম মাসুল দিতে হবে। খুব শাঁসালো ব্যবসাদার ছাড়া কেউ ঘেঁষতে পারবে না।

মুখোশ খোলার পর পার্থ দেখলেন চেনা মুখ একটাও নেই। একসঙ্গে দল বেঁধে খেলা দেখতে আসার অনুমতি দেয়নি কর্তৃপক্ষ। দর্শকদের এমনভাবে বিভিন্ন ব্লকে ছড়িয়ে দিয়েছে যাতে অপরিচিতদের মধ্যেই প্রত্যেককে বসতে হয়। নিরাশা যত বাড়ছে অযথা টাকা নষ্ট করার শোকটাও উথলে উঠছে। কত দিন ধরে যে ধারদেনা শোধ করতে হবে···।

চমকে উঠলেন পার্থ। সবে এসে বসেছেন আসনে। স্পষ্ট তাঁর নাম ধরে কে যেন ডাকল। কে যেন বলতে তো একটাই সম্ভাবনা। মাইক্রোফোন। সিঁটিয়ে বসলেন পার্থ। গ্যালারির সাধারণ কোলাহল ও ধারাবিবরণী এখন শুধু আবছা শুনতে পাচ্ছেন। সেই খবর ছাপিয়ে মাইক্রোফোন বলে চলেছে, "পার্থ মিত্র। পার্থ মিত্র। ভয় নেই। সাড়া দিন। আপনার কথা আমরা ছাড়া কেউ শুনতে পাবে না।"

পার্থ আতঙ্কিত স্বরে বলল, "হ্যাঁ, মানে শুনছি।"

"ধন্যবাদ, আপনি কি সত্যিই আপনার ঠাকুর্দার কথা জানতে চান ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়···"

"বেশ। তা হলে পাঁচ নম্বর ওভার শেষ হলেই টয়লেটে চলে আসবেন। উনিশ নম্বর টয়লেটে।"

"উনিশ ?"

"পাঁচ ওভার। উনিশ।" লুম্যানের কথা শেষ হওয়া মাত্র পার্থ ঘাড় ফিরিয়ে তাকান নীল বর্শা আঁকা গ্যালারির প্রহরীর দিকে। হাতে ট্রান্সমিটার নিয়ে বসে আছে। ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না এসব কাণ্ডের কোনও গন্ধ পেয়েছে বলে।

॥ ১১ ॥

ক্যাপ্টেন ওরিলির সঙ্গে করমর্দন সেরে দুই ওপেনার রওনা হয়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ আর বগোমলভ।

আবির ভেবেছিল এই ম্যাচে উদ্বেগের মোকাবিলা করতে হবে না। রান পাক বা না-পাক, পারিশ্রমিকের অঙ্কটা এমনই যে, তাকে আগামী তিন বছরের মধ্যে আর টাকাকড়ি নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। চাকরি ছেড়ে দিলেও নয়। কিন্তু মাইক্রোফোনের দৌলতে অসংখ্য দর্শকের হৃদস্পন্দনের ছোঁয়া পেতেই তার মনে হল, সে-ও যখন নামবে, অনেক প্রত্যাশা এইভাবে তাকে জড়িয়ে ধরবে।

পাতলা, বেঁটে চেহারা ইন্দ্রজিতের। বগোমলভ সাড়ে ছ' ফুট ঢ্যাঙা এক দস্যু। কিন্তু চেহারা দেখে তাঁদের মেজাজের হদিস লাভের চেষ্টা করলে ভুল হবেই। সতর্কতার শেষ কথা বগোমলভ আর ইন্দ্রজিৎ যে ঠিক কী, এক কথায় বোঝানো অসম্ভব। মারমুখো, হ্যাপি-গো-নাকি লাকি আনঅর্থোডক্স।* তবে টিকে গেলে তিনি যে-কোনও ওয়ান ডে-র মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

লেগ ও মিডলের গার্ড নিলেন ইন্দ্রজিৎ। তিন নম্বর বোলার তাঁর

দৌড় মাপছেন। অবশ্য দৌড় নয়, হেঁটে-হেঁটেই তিনি রওনা হয়েছেন বল করার জন্য। সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে, তাঁর বাঁ হাতটা কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করা রয়েছে— যেন বাঁ অঙ্গ পক্ষাঘাতে পড়ে গেছে। এবার তিনি ডান হাতটাকে বনবন করে ঘোরাতে শুরু করেছেন। আমগাছের মগডাল থেকে ঘুড়ি পাড়ার জন্য ঢিল-লঙ্গর করার ভঙ্গি। বোলিং ক্রিজে পা ফেলে ওই ঘুরন্ত হাত থেকেই এক ফাঁকে মুক্তি দিয়েছেন বলটাকে।

ইন্দ্রজিতের হয়ে মনে-মনে জপ করছিল আবির, বলটা যেন ঠিক লেগ স্টাম্পের ওপর ও গুড লেংথের চেয়ে খাটো স্পটটায় না পড়ে। ইন্দ্রজিতের ব্লাইন্ড স্পট। কিন্তু ঠিক তাই ঘটল এবং ইন্দ্রজিৎ জীবনে এই প্রথম ইনিংসের শুরুতেই তাঁর মারণাস্ত্রের সম্মুখীন হয়েও বেঁচে গেলেন। প্রবৃত্তিবশত স্টেপ আউট করতে গিয়েছিলেন। পা পিছলে পড়ে গেছেন তাই বেঁচেছেন। বলটা স্টাম্পের বেশ কিছুটা ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

তাও পুরো ওভার টিকতে পারেননি ইন্দ্রজিৎ। দু' রান করার পর এলোপাথাড়ি ব্যাট চালিয়ে লোফ্‌ফা ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলেন চার বলের মাথায়।

★ *গত বছরের 'ক্রিকেট হিউমার' লিখেছিল "অতি নির্ভরযোগ্য বগোমলভের একটাই দোষ, খেলতে-খেলতে মাঝে-মধ্যে উনি কয়েক ঘন্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙার পর অবশ্য খুবই ঝলসে ওঠেন, তখন ঘন্টাতিনেকের মধ্যে সতেরো, এমনকী আঠারো রানও করে ফেলেন। একবার ওঁর ব্যাটিং-ঘুমের সময়ে সব দর্শক, এমনকী আম্পায়ারও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমাদের দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য ওপেনার ইন্দ্রজিৎ আবার হিরের টুকরোর মতো লেট আউট সুইঙ্গার বা খেঁকশেয়ালের মতো ইয়র্কারকে কোনও পরোয়াই করেন না, কিন্তু মাথামোটা ফুলটস কি তালকানা লং হপই সাধারণত ইনিংসের শুরুতেই তাঁকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করে।"*

ওয়ান ডাউন একওয়েনসি। ম্যাকডোনাল্ড স্বগতোক্তির ভান করে সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললেন, "আমাদের হাইয়েস্ট স্কোরারের চেয়ে মাত্র দু' রান কম করবেন ইনি।" চিন ও আফ্রিকার খেলোয়াড় ম্যাকের রসিকতাকে উসকানি দেয়।

আবির একওয়েনসিকে সতর্ক করে দেয়, "তিন নম্বরের বোলিং অ্যাকশন কিন্তু ছলনাময়। ডান ইয়ার স্পিড চেকে দেখছি এইট্টি। খেয়াল রাখবেন!"

"থ্যাঙ্ক ইউ!"

এক-একটা বল হয় আর নতুন-নতুন শিক্ষা নেয় আবির। গুড লেংথ স্পটে বল পড়লে, সেটা সব সময়েই ছেড়ে দেওয়া সম্ভব। লাফিয়ে বেরিয়ে যাবে, উইকেট ছোঁবে না। অবশ্য শুধু তো টিকে থাকা নয়, রানও পেতে হবে।

বিনা দুর্ঘটনায় পাঁচ ওভার শেষ। তেরো রান। বগোমলভ এখনও খাতা খোলেনি।

ষষ্ঠ ওভারে ফিল্ডিংয়ের রদবদল চোখে পড়ল। নিশ্চয় কোনও মতলব আছে। সিলি পয়েন্ট, শর্ট লেগ ও আত্মঘাতী সিলি মিড অনে একটি করে ফিল্ডার রেখে নতুন বোলার আসছেন। সামনে বগোমলভ। তিনি এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন যে, মাটি থেকে ব্যাট না তুললে এখানে তাঁকে পরাস্ত করা খুব শক্ত। কিন্তু এবারের বলটা বুক সমান ফুলটস। পেছিয়ে এসে খেললে বাউন্ডারি পেতেন কিন্তু আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ব্যাটটা উঁচু করলেন। আর ব্যাটের ফলা ছেড়ে সেটা মাটিতে পড়ার আগেই সিলি পয়েন্ট ছোঁ মেরে তুলে নিলেন।

আবির নেমেছে। একওয়েনসি জানিয়ে দিলেন, শর্ট রান নিতে হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ছুটতে শুধু ব্যাটসম্যানদের অসুবিধে হচ্ছে না, ফিল্ডারদেরও তাই।

॥ ১২ ॥

আশা ও নিরাশার আরও নানারকম খেলা চলেছে মাঠের বাইরে।

পার্থ অবশ্য ইচ্ছাপূরণের সুযোগ পেতে চলেছেন। উনিশ নম্বর টয়লেটের বন্ধ দরজার ভেতরে আবার সেই লুম্যানের গলা, "সময় রক্ষার জন্য ধন্যবাদ। বলুন, আপনার ঠাকুর্দার সম্পর্কে কী জানতে চান?"

পার্থ এখন অনেকটা সাহস পেয়েছেন, "সব। যা জানা সম্ভব, সব জানতে চাই। কেন এসেছিলেন, কী করতেন, তাঁর ছবি বা ডায়েরি। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়—" এক নিশ্বাসে বলে যায়।

"তা হলে তো কয়েক দিন থাকতে হবে আপনাকে।"

"যত দিন দরকার, সারা জীবন থাকতে হলেও আমি রাজি।"

"ভাল করে ভেবে দেখুন। দিন চারেকের মধ্যেই আমরা অবশ্য আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাতে যদি আপনার ক্ষতি হয়..."

"ক্ষতি হলেও আমি থাকব।"

"বেশ। আর কোনও প্রশ্ন?"

"দু-একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনারা কি থট রিডিং জানেন? কী ভাবেই বা পুলিশদের ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে কথা—"

"থট রিডিং নয়, পৃথিবীর যত দর্শক এখানে এসেছেন প্রত্যেকের সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের কম্পিউটারের মগজে ভরা আছে। আপনার আসার উদ্দেশ্য আমরা জানতাম। আর সংযোগ স্থাপন? এমন এক তরঙ্গের সাহায্য নিয়েছি যা আপনাদের গোয়েন্দা বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে পারবেন না, ধরা দূরের কথা।"

"আমার মতো আরও অনেকেই কি..." পার্থর প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই নিরেট দেওয়ালের মধ্যে ফুটে উঠল একটা দরজার পাল্লা।

লুম্যান আহ্বান জানালেন, "এদিকে আসুন।"

পার্থ গুপ্তপথে পা বাড়ালেন আর সঙ্গে-সঙ্গে পার্থর পরিচয়মূলক নম্বর গলায় ঝুলিয়ে এক দ্বিতীয় পার্থ টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন। নকল পার্থ গ্যালারির ফাঁকা আসনটা ভরিয়ে না ফেললে ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেরি হত না।

এরকম ক'জন ছদ্মবেশী আসলের জায়গা দখল করেছেন, বলা দুষ্কর।

॥ ১৩ ॥

মিস টাইমিং, মিস হিট, দুটো নির্ঘাৎ ক্যাচ, বার তিনেক রান আউট ও একটা স্টাম্পিংয়ের সুযোগ দিয়েও টিকে আছে আবির আর একওয়েনসি। দাঁতে-দাঁত টিপে উইকেট কামড়ে বিশল্যকরণী আর সঞ্জীবনী সুধা খুঁজছে।

দু' উইকেটে ছিয়াত্তর কিন্তু আর মাত্র তেরো ওভার বাকি। রান রেট বাড়ানোর কোনও উপায়ই কি নেই?

মানমন্দিরের প্রান্ত থেকে স্পিনার ডাকা হয়েছে। দু'বার পরাস্ত হয়েছে আবির। দারুণ ঘুরছে বল। আর তেমনই ধাঁধিয়ে দিচ্ছে ফ্লাইট। ওয়েল ফ্লাইটেড ঝুলন্ত বল উপবৃত্তাকার পথে মাটিতে আঘাত করার পর প্রায় গড়িয়ে আসে অথচ কম ফ্লাইটের একই গতিসম্পন্ন বল বেশি লাফায়।

এ অবধি ওরা রান যা পেয়েছে, সবই প্রায় উইকেটের পেছন থেকে। ফ্লিক বা গ্লান্স। ফিল্ডারদের অবস্থান দেখলেও সেটা একনজরে এখন ধরা যায়। একওয়েনসি যদি অভিনব কায়দায় রান নেওয়া শুরু না করতেন তা হলে এর অর্ধেকও স্কোর উঠত কি না সন্দেহ। কোনওরকমে পাঁচ-সাত পা সতর্কভাবে দৌড়েই স্কিট খেয়ে

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

তিনি বিপরীত উইকেটে পৌঁছে যাচ্ছেন। আবিরও কায়দাটা রপ্ত করে নিয়েছে।

পরের ওভারের প্রথম বলেই একওয়েনসির অধৈর্য প্রকাশ পেল। জবরদস্ত এবং কপিবুক-সম্মত হুক। কিন্তু লঙ লেগের ফিল্ডার একটা ছোট্ট লাফ মেরেই তার মাথার চার ফুট ওপর থেকে ক্যাচটাকে পেড়ে ফেললেন।

ক্যাপ্টেন ওরিলি নামছেন। আবির বুঝতে পারে উইকেটের সামনে শট নিতে না পারলে কিছুতেই রানের গতি বাড়ানো সম্ভব নয়।

ওভারের শেষ বলে বোল্ড হয়ে গেলেন ওরিলি। ব্যাটের ইনারশিয়া তাঁকে ঠকিয়েছে। পুরো ব্যাক লিফট নিয়ে খেলতে অভ্যস্ত। স্ট্রেট ড্রাইভ করতে গিয়েছিলেন ব্যাটের শ্লথ আচরণের জন্য টাইমিং-এ গণ্ডগোল।

আর দশ ওভার বাকি। একাশি রানে চার উইকেট।

ব্যাটটা কাঁধে তুলে এবার স্টান্স নিয়েছে আবির। নতুন করে গার্ড নিল লেগ স্টাম্পে। ব্যাক লিফটের প্রয়োজন হবে না আর। একটা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ব্যাটটা ওপর থেকে নেমে এসে আঘাত হানবে।

টাইমিংটা ঠিক করে নিতে প্রথম দুটো বল শুধু আটকেছে। নিখুঁত কভার ড্রাইভ তৃতীয় বলটাকে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। হবে—এভাবেই হবে। নিজেকে বোঝায় আবির। ইনিংসের তৃতীয় বাউন্ডারি। দর্শকদের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ছে।

তিন ওভারে বিপক্ষকে নয়ছয় করে সাঁইত্রিশ রান তুলে নিয়েছে আবির। তাকে স্ট্রাইক দিয়ে যাচ্ছেন ম্যাক। আবিরের রান আটকানোর জন্য ফিল্ডারদের নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ থেকে একটাও রান পেল না আবির। আর ভুলটাও হল সেই কারণে। এই প্রথম স্ট্রেট ব্যাটে না খেলে কাট করার চেষ্টা করেছিল। ফার্স্ট স্লিপে ধরা পড়ে গেল।

সিক্সটি সেভেন। স্ট্যান্ডিং ওভেশন। আর তারই মধ্যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর কিছু চিৎকার। "টিচ দ্য স্লেভস! বিট দ্য স্লেভস!" সংক্রামক ব্যাধির মতো বিশ্ব-দরবারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার প্রতিধ্বনি ওঠে।

প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। এইসব কথা পৃথিবীর ভাবমূর্তি নষ্ট করবে। মুশকিল হচ্ছে, কাউকেই শনাক্ত করা সম্ভব নয়। পাশের লোকটিও যদি গালি দেয় ধরার উপায় নেই। সবই চলছে মাইক্রোফোনের মধ্যস্থতায়। কিন্তু মাস্টার কন্ট্রোল অতটা অসহায় নয়। জটিল কম্পিউটার নির্ভর স্বর-বিশ্লেষক যন্ত্রের সাহায্যে আপত্তিকর শ' দুয়েক লোককে গ্রেফতার করে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

একশো বাহান্ন রানে ইনিংসের ওপর যবনিকা। পঞ্চাশ ওভার ফুরিয়ে গেছে।

॥ ১৪ ॥

খেলোয়াড়রা প্যাভিলিয়নে ফেরার আগেই চাঁদের বাসিন্দাদের কারিগরি সভ্যতার আর-একটা বিস্ময়কর নিদর্শন দেখা গেল। গ্যালারির প্রত্যেক ব্লকের দু' কোণে একটা করে সবুজ লেটার বক্সের মতো জিনিস রয়েছে। এতক্ষণ সেটার উপযোগিতা বোঝা যায়নি।

মাইক্রোফোন ঘোষণা করল, "পৃথিবীর দর্শকদের জন্য আমাদের প্রীতি-উপহার সংগ্রহ করে নিন। গ্যালারির দুই প্রান্তের স্বয়ংক্রিয় প্রিন্টার আপনাদের জন্য তৈরি করেছে সচিত্র স্কোরকার্ড।"

বাক্সের সামনে হাত পাতলেই খসে পড়ছে স্কোরকার্ড। কৌতূহলী দু'-চারজন প্রথম এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো গ্যালারি ভিড় জমিয়ে ফেলেছে স্কোরকার্ড সংগ্রহের জন্য।

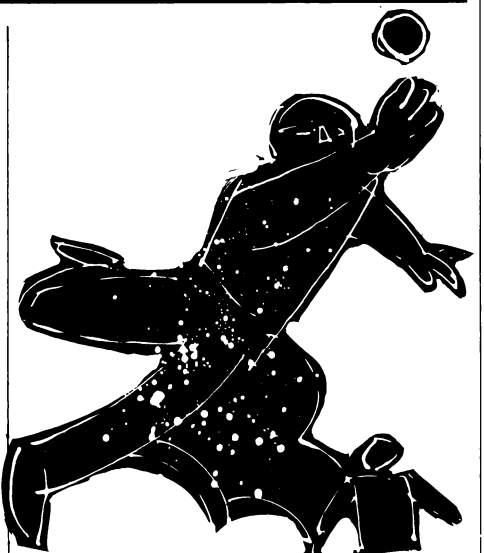

নামেই স্কোরকার্ড। কাগজ, বোর্ড, এমনকী প্লাস্টিকের ওপর ছাপা কিছু হলেও না হয় বোঝা যেত। পকেট ক্যালকুলেটরের মতো আকারের এক-একটি ভিডিও সেট। প্রত্যেক ব্যাটসম্যানের নামের পাশে একটি করে বোতাম। সেটা টিপলেই স্ক্রিনে ভেসে আসছে তার ইনিংসের চলচ্চিত্র। এমনকী 'অতিরিক্ত'-র পাশের বোতাম টিপলেই ১২টা এক্সট্রা কীভাবে এসেছে—কার কোন বল থেকে—সেটাও একে-একে ফুটে উঠছে।

সিনক্লেয়ারও একটা ভিডিও স্কোরকার্ড সংগ্রহ করেছেন। উলটেপালটে খুঁটিয়ে দেখছেন কোনও নির্মাতার নাম আছে কিনা। তা হলে এক্ষুনি জানাতে হবে কন্ট্রোলকে।

এবারও নিরাশ হয়েছেন সিনক্লেয়ার। অভিযোগ করার মতো এখনও কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না।

স্কোরকার্ডের ওপর আপনা থেকেই চোখ বুলিয়ে যান সিনক্লেয়ার:

ভিডিও স্কোরকার্ড

ওয়ার্ল্ড ইলেভেন

● *ইন্দ্রজিৎ ক· ৯ (উইকেট কিপার) বো· ৩*	— ২
● *বগোমলভ ক· ৫ বো· ৬*	— ০
● *একওয়েনসি ক· ৮ বো· ৭*	—৩৯
● *আবির ক· ২ বো· ৪*	—৬৭
● *ওরিলি (ক্যাপ্টেন) বো· ৪*	— ২
● *ম্যাক বো· ৬*	—২০
● *শিউলাল (উইকেট কিপার) ক· ৯ বো· ৩*	— ৮
● *গিলক্রিস্ট বো· ৭*	— ১
● *সাইমন নট আউট*	— ১
● *ওয়াঙ নট আউট*	— ০
● *অতিরিক্ত*	—১২
মোট (৮ উইকেটে)	১৫২

আবিরের নামের পাশের বোতামটা টেপেন। চোখটা স্ক্রিনের ওপর কিন্তু মনটা নেই।

পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে কাল অবধি সিনক্লেয়ার ছিলেন সবচেয়ে লেজমোটা ভি· আই· পি·। এমনকী টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও 'প্রতিরক্ষা সচিব' হিসেবে সামগ্রিকভাবে নিযুক্ত করেছে তাঁকে।

'সিকিউরিটি' লেখা তিন চাকার ছোট্ট ইলেকট্রিক গাড়িটা হাঁকিয়ে বেজায় ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে তিনি প্রথম থেকেই মাঠের বিভিন্ন জায়গা চষে বেড়াচ্ছিলেন। কোথায় উইকেটের পেছনে স্টারট্রেক-এর বিজ্ঞাপনটা বসবে, কোন হোর্ডিংটা এক ফুট বেশি লম্বা হয়ে গেছে ইত্যাদি তদারক করেছেন। কিন্তু আসলে তাঁর দৃষ্টি ছিল লুনার বিজ্ঞাপনের দিকে। কারণ লুম্যানরা বিশ্ব টেলিভিশনের কাছে তাঁদের কোনও বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য আবেদন জানাননি। অথচ সবাই নিঃসন্দেহ যে, আজকের ম্যাচটা স্রেফ অছিলা। আসলে পৃথিবীর বাজারে নিজেদের মালপত্র বেচার সুযোগ তৈরি করার জন্যই এইসব কাণ্ড। কিন্তু কোথায় ওঁদের বিজ্ঞাপন ?

সিনক্লেয়ার ভিডিও স্কোরকার্ড পকেটে ভরে ট্রান্সমিটার তুলে নেন মুখের কাছে।

"ইকেরাস ! ইকেরাস ! কন্ট্রোল রুম প্লিজ। কোড নাম্বার ফাইভ নাইন সেভেন।"

লেশনার রিসিভ করেন কল। বিশ্ব সরকারের দুই প্রতিনিধি লেশনার ও অ্যান্ড্রু এবং ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দয়াল ও শিবশঙ্কর 'ইকেরাস' ছেড়ে নামেননি। চাঁদকে ঘিরে পাক খেতে-খেতেই তাঁরা কড়া নজর রাখছেন সব কিছুর ওপরে। তাঁদের সঙ্গে আছেন একদল কম্যান্ডো আর বারোজন চিকিৎসক। দায়িত্বের সবচেয়ে ভারী বোঝাটা এই ক'জনেই বইছেন আজ।

সিনক্লেয়ার বলেন, "কিছু অস্বাভাবিক চোখে না পড়াটাই সবচেয়ে অ্যাবসার্ড বলে মনে হচ্ছে। এত টাকা খরচ করে তাঁরা তা হলে আমাদের নিয়ে এলেন কেন ! পৃথিবীর বাজারে ওঁরা যদি ওঁদের কোনও জিনিস বেচতে না চান—তা হলে তো কোনও মানেই হয় না !"

লেশনার বোঝাবার চেষ্টা করেন, "উদ্দেশ্য আরও অনেক রকমই থাকতে পারে। আপনি শুধু আপনার লাইনেই ভাবছেন, তাই হয়তো···"

সিনক্লেয়ার তবু গজগজ করেন। লেশনার বলেন, "আপনি কন্‌ভিল্ডড নন, বুঝতে পারছি। এক কাজ করুন, চাঁদের পিঠে আমাদের কমান্ডার-ইন-চার্জ কার্লফ-এর সঙ্গে বরং কথা বলুন। আপনার লাইনটা ওঁর কাছে রিডাইরেক্ট করে দিচ্ছি।"

চান্দ্র-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিটিংয়ের মধ্যেই সিনক্লেয়ারের কলটা ধরলেন কার্লফ। হ্যাঁ-হুঁ করে শান্তভাবে সব বক্তব্য শুনে কার্লফ জানালেন, "ডোন্ট ওরি সার ! এবার নিশ্চিন্ত মনে নিজের সিটে বসে খেলাটা বরং উপভোগ করুন। আমার মনে হয় না, আপনার আর কিছু করার আছে। সত্যি বলতে, আপনাকে হিংসে হচ্ছে। এই মিটিং করতে-করতে আর কন্ট্রোল রুমের জেরার জবাব দিতেই বোধ হয় সারাক্ষণ কেটে যাবে। খেলা দেখব যে একটু মন দিয়ে···"

কার্লফ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার আগেই সিনক্লেয়ার বাধা দিয়ে

১৯২৫ : সি-প্লেনে ইতালি-অস্ট্রেলিয়া-জাপান

ইতালির সেস্তো ক্যালেন্দে থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল জেনারিয়েল্লো নামের এক স্যাভোয়া মার্চেত্তি-১৬ সি-প্লেনে বিশ্বজয়ে রওনা হন মার্কুইস কর্নেল ফালেস্কো দ্য পিনেদো। তাঁর সঙ্গী ছিলেন এঞ্জিনিয়ার ক্যাম্পানেল্লি। ৩৪,১৭৫ মাইল উড়ে অস্ট্রেলিয়া ও জাপান ঘুরে তাঁরা রোমে ফেরেন ৭ নভেম্বর।

দ্য পিনেদো অস্ট্রেলিয়ার পথে কলকাতায় গঙ্গাবক্ষে নামেন ১২ মে ও পরদিন আকিয়াবের দিকে রওনা হয়ে যান। কলকাতায় থাকার সময়ে তাঁকে ঘিরে এক মজার ব্যাপার হয়, এর ফলে তিনি এখনও বিখ্যাত হয়ে আছেন। পথিকৃৎ বৈমানিকেরা সাধারণত উৎসাহী এয়ারমেল সংগ্রাহকদের অনুরোধে তাঁদের দেওয়া চিঠি নিয়ে যেতেন নিজেদের বিমানে, অনেক সময়ে এগুলিতে তাঁরা নিজেদের স্বাক্ষর দিয়ে দিতেন। এইসব চিঠিপত্র এখনও সংগ্রাহকদের কাছে অমূল্য ও ওইসব অসমসাহসী বৈমানিকদের অভিযানের সাক্ষী হয়ে আছে।

কলকাতায় এ-ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন দন্ত চিকিৎসক ডাঃ স্টিফেন স্মিথ। ভারতে বিমানডাক সংগ্রহে (ইংরেজিতে যার নাম অ্যারোফিলাটেলি) তিনিই পথিকৃৎ। ডাঃ স্মিথ দ্য পিনেদোকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১২৪টি চিঠি ও ৩২টি পোস্টকার্ড এবং মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়ার জন্য ৯৩টি চিঠি দেন। দ্য পিনেদো রেঙ্গুন ও মেলবোর্ন থেকে ডাকে ওই চিঠিগুলি ফেরত পাঠাবেন। মার্কুইস দ্য পিনেদো সবক'টি চিঠিতে তাঁর নাম সই করে দেন। তারপরই হঠাৎ মেলবোর্নের চিঠিগুলির জন্য তিনি ইতালির দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে চিঠিপ্রতি ২০ টাকা দাবি করেন। ডাঃ স্মিথ অত টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় পিনেদো খামের যে অংশে তাঁর সই ছিল সেটি কেটে ফেলে দেন। পরে অস্ট্রেলিয়া থেকে বাকি আধখানা চিঠি প্রেরকদের কাছে এসে পৌঁছয়।

দ্য পিনেদো এই বিশেষ চিঠির জন্য বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

স্যাভোয়া মার্চেত্তি এস-১৬ বিমানের বিশদ বিবরণ :
নির্মাতা : সোসিয়েতা ইদ্রোভোলান্তি আল্‌তা, ইতালি।
ডানার আয়তন : ১৫·৪৯ মিঃ।
লম্বায় : ৯·৯০ মিঃ।
বৈমানিক ও যাত্রী : একজন বৈমানিক ও চারজন যাত্রী।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১৯৪ কিমি।
রেঞ্জ : ৮০৫ কিলোমিটার।
এঞ্জিন : একটি ৪৫০ অশ্বশক্তির আই· এফ· এল· ডি।

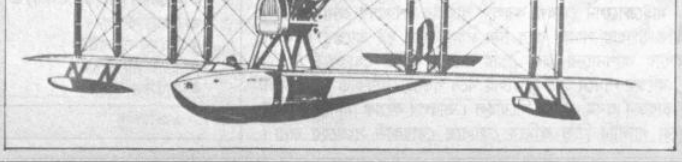

বলেন, "কিন্তু, ধরুন, হঠাৎ খেলা চলার সময়েই ওঁরা না বলেকয়ে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে দিলেন। এই ধরুন, টিভি ক্যামেরায় ঠিক ধরা পড়ে যাবেন এইভাবে বেলুন-টেলুন উড়িয়ে দিলেন…"

হাসিতে হেডফোন ফাটার উপক্রম, "বেলুন ! চাঁদের আকাশে যে বেলুন উড়বে না মিস্টার সিনক্লেয়ার… ।"

"বেলুন মানে, কথার কথা, অন্য কিছুও তো…"

"বলছি তো কোনও আশঙ্কা নেই। চাঁদের চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করেছি বলেই এত জোর দিয়ে বলতে পারছি।"

॥ ১৫ ॥

চাঁদের হাই-পাওয়ার সরকারি মহলের সঙ্গে আলোচনাসভাটা স্টেডিয়ামেরই একাংশে বসবে, এটা কেউ ভাবেনি। বিশ্ব ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দুই প্রতিনিধি খান্না ও গোপালন আর রাজনৈতিক তথা সামরিক প্রতিনিধি কার্লফ ও কিথ রীতিমত নিরাশ। কেউই ভাবতে পারেননি, চান্দ্র-সরকার ভি আই পি-দের জন্যও একটা সংক্ষিপ্ত সফর বা নিদেনপক্ষে ক্যাবিনেট পর্যায়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করবে না।

কার্লফই প্রথম অভিযোগের সুরে বললেন, "আমরা আশা করেছিলাম এই মিটিংটার সময় অন্তত স্পেস স্যুট খুলে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা চালাতে পারব।"

চাঁদের চিফ সেক্রেটারি মিস্টার ওমেগা বললেন, "দুঃখিত। আমাদের কাছে চেহারার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। স্পেস স্যুট শুধু চেহারাটাকেই আড়াল করে। আচরণ নয়।"

কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন খান্না, "স্টেডিয়ামে আপনাদের ব্লকে দর্শকসংখ্যা তো অতি নগণ্য। ক্রিকেট কি খুব জনপ্রিয় নয় ?"

উত্তর আসার আগেই ও'কিফ প্রশ্নটার সঙ্গে একটা অন্য তাৎপর্য জুড়ে দেন, "না না, ওরকম অনুমান করছেন কেন, হয়তো এখানকার পপুলেশন…"

কথা শেষ করতে দেননি ওমেগা, "সৌজন্যমূলক সফর এটা। আপনারা নিশ্চয় আমাদের দেশ সম্বন্ধে এমন কিছু কৌতূহল প্রকাশ করবেন না, যেটার সামরিক গুরুত্ব থাকতে পারে। পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনও কৌতূহল নেই।"

ওমেগা খান্নার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "আপনার অনুমান অবশ্য ঠিক। দাবা ছাড়া কোনও খেলারই চল নেই এখানে। পৃথিবীতে ক্রিকেট সবচেয়ে জনপ্রিয় বলেই আজকের আসর বসিয়েছি আমরা।"

কার্লফ বললেন, "মিস্টার ওমেগা ! একটা কথা বলে নিই। কথার ফাঁকে আপনাদের সম্বন্ধে হয়তো কিছু অন্যায় কৌতূহল প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু সেটা নিছকই কৌতূহল। খারাপ উদ্দেশ্য সত্যিই কিছু নেই। আমি বরং সবার আগে আসল কথাটা সেরে নিই। টাকা-পয়সার হিসেবটা। আপনাদেরই কমিটমেন্ট মতো এখনও কিছু…"

ওমেগা বললেন, "দশ মিনিট বাদে আপনারা আপনাদের মহাকাশযানের কন্ট্রোলের সঙ্গে কথা বলবেন। তার মধ্যেই ব্যালান্স পেমেন্ট আমরা পৌঁছে দেব।"

ও'কিফ জানতে চান, "আমরা যদি পৃথিবীতে একটা পালটা ম্যাচের ব্যবস্থা করি, আসবেন আপনারা ?"

"নিশ্চয় আসব। কিন্তু তার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, বছর পঞ্চাশ আগের সেই ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না।"

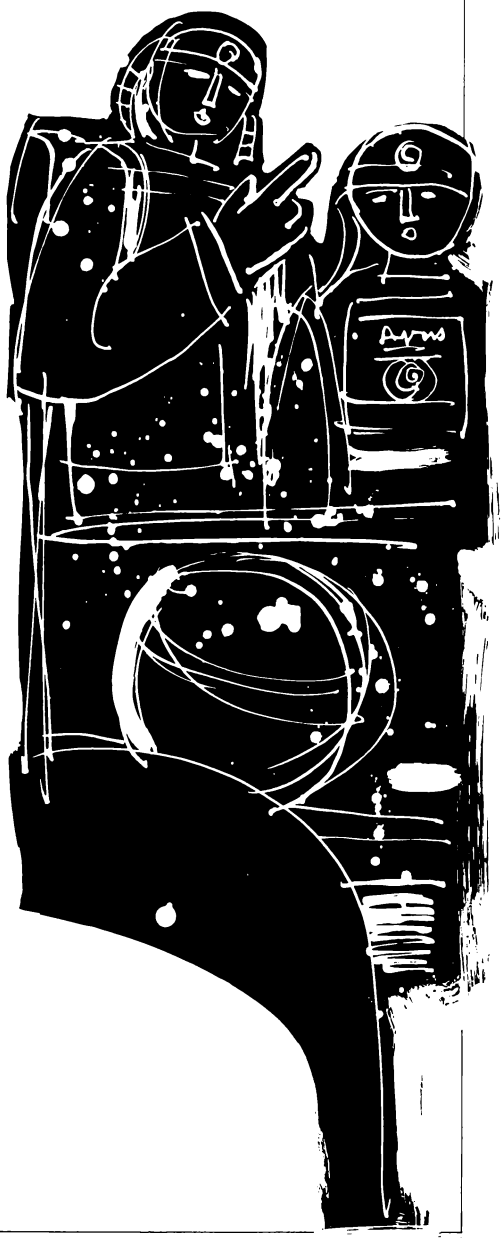

খান্নারা তিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা। নিজেকে বাঙালি বলেই মনে করেন। খান্না রসিকতা করে বলেন, "বাহ! আপনি তো দিব্যি শুদ্ধ বাংলা বলেন। পুনরাবৃত্তি। বাঙালিরাও এখন রিপিটেশনের বাংলা পরিভাষা জানে না।"

ওমেগা বিনীতভাবে নিবেদন করেন, "ওটার কৃতিত্ব আমার নয়। কম্পিউটারের। আমার বক্তব্যকে কম্পিউটারই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত করে মাইক্রোফোনের মধ্যস্থতায় পৌঁছে দিচ্ছে আপনাদের কাছে। বিভিন্ন ভাষায়।"

এতক্ষণে অ্যান্ড্রু প্রথম মুখ খোলেন, "মিস্টার ওমেগা, আমরা কিন্তু খুবই বিস্মিত হয়েছি একটা ব্যাপারে। এই ম্যাচকে উপলক্ষ্য করে আমাদের ব্যবসায়ীরা কত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে কিচ্ছু নেই। আপনারা কি···।"

ওমেগা বললেন, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা প্রথমে আমাদেরও ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। খামোখা এখানে আপনারা মোটরগাড়ির বিজ্ঞাপন কেন দিচ্ছেন। হাওয়া-পোরা টায়ার বা অক্সিজেন দহনকারী পেট্রল বা ডিজেল এঞ্জিন তো চাঁদে চলবে না। তারপর বুঝেছি, আসলে এটা পৃথিবীতে গাড়ি বেচার জন্যই করছেন আপনারা। চাঁদের মার্কেট দখলের জন্য নয়। আসলে আমাদের এখানে অর্ডার বা প্রয়োজন অনুসারেই সব কিছু তৈরি হয়। বিজ্ঞাপন ব্যাপারটাই অচল। নিউ কনসেপ্ট। পৃথিবীতে আমরা অবশ্যই আমাদের তৈরি জিনিস বেচতে চাই। কিন্তু তার জন্য যে···আশা করি, যদি রিটার্ন ম্যাচ একটা হয়, পৃথিবীতে আমরা খেলতে যাই, তখন কিছু বিজ্ঞাপন তৈরি করা যাবে। আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা আপনাদের প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপন স্টাডি করতে শুরু করে দিয়েছেন।"

॥ ১৬ ॥

কয়েদির সংখ্যা আড়াইশো হওয়ার পরে সাত নম্বর সিকিউরিটি এজেন্টের বিশেষ অনুরোধে এক কামরার একটা মোনো রেলের ব্যবস্থা করে দিল লুনার গভর্নমেন্ট।

বাকি খেলা দেখতে না পাওয়ার জন্য কোনও আফসোস নেই গুহ রায়ের। এই আড়াইশো জনের মধ্যে তাঁর নিজের শিকারই একশো সাতাত্তর।

সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রহরী নেওয়ার প্রস্তাব তিনি এক শব্দে উড়িয়ে দিয়েছেন। চলন্ত মোনো রেলের লম্বাটে কামরার এক দিকের দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে গুহ রায়। বাঁ হাতে একটা থার্মো সেনসিটিভ সাব-মেশিনগান। ডান হাতে ট্রান্সমিটার।

অল্প কথার লোক গুহ রায়। প্রথমেই যাত্রীদের জানিয়ে দিয়েছেন বসিয়ে রাখার চাইতে তিনি বেশি পছন্দ করেন অপরাধীরা শুয়ে থাকুক। গুহ রায়ের ডান পা-টা একটু উঁচু করে দৃষ্টি আকর্ষণ না করালেও কয়েদিদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে, মেঝের ওপর যে তিনজন পড়ে আছে তারা আর কোনও দিনই উঠে বসবে না।

মোনো রেল মহাকাশবন্দরে পৌঁছে দিল যাত্রীদের। তিন মিনিটের মধ্যেই ফেরি-রকেট আসবে তাদের ভ্রাম্যমাণ স্পেস শিপ ইকেরাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কয়েদিরা নির্দেশমতো সারি দিয়ে এগোচ্ছেন। সবার পেছনে গুহ রায় একটা ইলেকট্রিক ট্রলিতে চড়ে চলেছেন মৃতদের সঙ্গে।

ঠিক এয়ার লক পেরিয়ে বেরনো মাত্র দুশো বাইশ নম্বর কয়েদি আচমকা শরীরে আধখানা মোচড় দিয়ে গোলকিপারের মতো ডাইভ দিল।

গুহ রায় ছিটকে পড়েছেন ইলেকট্রিক ট্রলি থেকে। ট্রলিটা তবু থামেনি—চালকহীন ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সাব মেশিন ও ট্রান্সমিটার দুই-ই ছিটকে গেছে গুহ রায়ের হাত থেকে। দুশো বাইশ চড়ে বসেছে গুহ রায়ের বুকে। গুহ রায় যেন বিনা যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে নিতে চাইছেন।

দুশো বাইশ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অন্য কয়েদিদের দিকে। তার

কাছে ট্রান্সমিটার নেই কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় সে কী আশা করছে।

কিন্তু কেউই এগিয়ে এল না আগ্নেয়াস্ত্রটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। আর ঠিক সেই সুযোগেই গুহ রায়ের স্পেস স্যুটের ডান হাতের দস্তানার সঙ্গে সংযুক্ত ধারালো ছুরির ফলাটা শকুনের দাঁতের মতো খুবলে ছিঁড়ে দিল বাইশ নম্বরের পোশাকের পিঠের কাছটা।

অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল স্পেস স্যুট ছেঁড়া মাত্র। গুহ রায় নিজেকে বাঁচাতে জানেন।

ইকেরাসে স্বয়ং লেশনার এসে হ্যান্ডশেক্ করে অভ্যর্থনা জানালেন গুহ রায়কে, "ওয়েল ডান ! ওয়েল ডান ! কফি না কোল্ড ড্রিঙ্কস ?"

"কিচ্ছু না, আমি আবার ফিরে যেতে চাই। ব্যবস্থা করুন। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস শুধু জানিয়ে দেওয়া দরকার। প্রয়োজন ছাড়া আমি চরম ব্যবস্থা নিই না। মৃত চারজনের মধ্যে একজনের জন্য শুধু আমি দায়ী। বাকি তিনজন, আমার প্রহরীরা টেনে আনে, তখনই তারা শেষ। কারণটা রহস্যময় !"

"ডাক্তারদের টিমের হাতে···"

"তার কোনও ফুরসত ছিল না। ওদের ডেডবডিই আবিষ্কার করি। অসুস্থ অবস্থায় নয়।"

গুহ রায়কে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে লেশনার ইন্টারকমে তলব করলেন কর্নেল দেশমুখকে। দেশমুখ মেডিকেল টিমের ইনচার্জ।

"কর্নেল, আপনি কি ডেডবডি পরীক্ষা করেছেন ?"

"ইয়েস সার। সবই অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু।"

মুহূর্তের জন্য সময় নেন লেশনার। তার পরেই অর্ডার দেন, "আপনি মর্গ-রুমে থাকুন। আমি আসছি। একা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। জরুরি।"

কিন্তু দেশমুখের সঙ্গে কথা বলার আগেই লেশনার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মৃত ব্যক্তিদের স্পেস স্যুটগুলো নিয়ে। সেগুলো এই কামরারই এক পাশের কেবিনেটে রাখা হয়েছিল।

মিনিট তিনেকের পর লেশনার তাকালেন দেশমুখের দিকে,

"একটা আন্দাজ করছি, ঠিক না হলে বলবেন। এই যে স্পেস স্যুটটা—দুশো বাইশ নম্বর—গুহ রায়ের হাতে···"

"রাইট সার। গুহ রায় সে-কথা নিজেই আমাকে জানিয়ে গেছেন। বাকি তিন জনেরই স্পেস স্যুট লিক করেছে। সেজন্য···"

"চুপ করুন। এ-কথা আর কাউকে বলেছেন ?"

"না সার।"

"ও· কে·। দয়ালকে এক্ষুনি ডেকে পাঠান।"

দয়াল ঢোকা মাত্র লেশনার বললেন, "কর্নেল, আপনি কি এবার এই তিনজনের মৃত্যুর কারণ একটু বুঝিয়ে বলবেন ? মিস্টার দয়াল বিজ্ঞানের লোক, আমি না বুঝি, উনি তো বুঝবেন ?"

দেশমুখের বক্তব্য শোনার পরেও দয়াল বিচলিত হয়নি। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন লেশনারের দিকে। "শুনলাম। কিন্তু আমাকে ডাকার কারণটা বোধগম্য হল না।"

"এক্ষুনি হবে। আসুন এদিকে। এই স্পেস স্যুটগুলো একবার কষ্ট করে দেখুন। এই যে—এটা দুশো বাইশের। দেখছেন ? এই যে কাটা দাগটা—গুহ রায়ের ছুরির ফলা চলেছে এই বরাবর। ঠিক আছে ? বেশ। এবার এইটা দেখুন। একটু কষ্ট করতে হবে এবার। ঠিক কোথায় যে স্যুটটা ফুটো হয়েছে— অযথা আপনার সময় নষ্ট করব না। বগলের কাছের জোড়টা দেখুন। হ্যাঁ, ওইখান দিয়েই এই হতভাগ্যের প্রাণ বেরিয়ে গেছে।"

লেশনার স্যুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন দয়ালের চোখে চোখ রেখে, "এবং সবচেয়ে আকর্ষক ও প্যাথেটিক ব্যাপার হচ্ছে, যে-তিনজনে এইভাবে মরেছে, তাদের প্রত্যেকের স্পেস স্যুটেরই ওই বগলের কাছে জোড় খুলে গেছে। তার অর্থটা কি আপনি জানেন ?"

দয়ালের মুখ থেকে রক্ত উবে গেছে তবু নিজেকে সামলাবার শেষ চেষ্টা করেন, "সে আর বলতে। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট। ইনসিওরেন্স কম্পানি নিশ্চয় স্পেস স্যুট নির্মাতার কাছ থেকে পুরো খেসারত···"

লেশনারের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি থামিয়ে দিল দয়ালকে। "মিস্টার দয়াল, তার আগেই কিন্তু তিনজন কিংবা আরও বেশি মানুষের, এখনও তো সব খবর জানি না, এদের মৃত্যুর জন্য আপনাকে দায়ী করা হবে। স্পেস পাওয়ার কম্পানিকে অর্ডার দেওয়ার পেছনে আপনার ভূমিকা অনেকেরই অজানা নয়। এবং কীভাবে তারা অর্ডারটা কব্জা করেছে সে-তথ্য সুপার স্পেস কস্টিউমই আমাকে জানিয়েছে। কিন্তু তখন আমার কিছু করার ছিল না।"

দয়াল মৃতদেহ রাখার টেবিলের ওপরেই বসে পড়েছেন,দু' হাতে মুখ চাপা দিয়েছেন।

লেশনারের নির্দয় কণ্ঠস্বর আবার কাঁপিয়ে দিল দয়ালকে, "আবেগ প্রবণতা হত্যাকারীদের মানায় না। আপনার চেতনায় অনুশোচনা জাগানোর জন্য ভাবিনি। ব্যাপারটা এখন অবধি আমরা তিনজনই জানি। গুহ রায়ও আসল কথাটা বোঝেননি।"

দয়াল উঠে দাঁড়ালেন, "আপনারা যা বলেন··?"

"কিন্তু আপনাকে বাঁচিয়ে আমাদের কী লাভ ?"

"লাভ হবে। হবেই। বিশ্বাস করুন। আমি—আমি স্পেস পাওয়ারের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলব। প্লিজ, বিশ্বাস করুন। কিন্তু—কিন্তু সত্যিই কি বাঁচাতে পারবেন আমায় ?"

লেশনার আর কর্নেলের মধ্যে চোখে-চোখে কথা হয়ে গেল। কর্নেল বললেন, "আমাদের কথা আপনি যদি সত্যিই ভাবেন, তার প্রমাণ পাই, তা হলে আমি সার্টিফাই করে দেব যে, হৃদযন্ত্রের

বিকলনই এদের মৃত্যুর কারণ।"

॥ ১৭ ॥

হতাশাজনক লাঞ্চ ব্রেকের পর ওরিলি লিড করে আনলেন তাঁদের টিম। হতাশাজনক, কারণ চাঁদের দেশের একটি পদও চেখে দেখার সুযোগ পাননি তাঁরা। বিশ্ব ক্রিকেট পরিষদের ইচ্ছে নয়। কোনও ঝুঁকি নেওয়া চলবে না।

প্রথম ছ' ওভারেই খেলার প্রায় সব আকর্ষণ উবে যাওয়ার মুখে। গিলক্রিস্ট ও সাইমন—দুই ফাস্ট বোলারই পুরোপুরি ব্যর্থ। না লেংথ, না নিশানা, না বাউন্স। পাঁচ ওভারে বিয়াল্লিশ রান। তার মধ্যে দশটা ওয়াইড।

ষষ্ঠ ওভারে স্পিনার আনার আগেই ম্যাক এগিয়ে এসে ওরিলিকে বললেন, "ক্যাপ, প্লিজ, আমাকে একটা ওভার দাও। আমার মনে হয়, আই হ্যাভ গট অ্যান আনসার!"

অলরাউন্ডার ম্যাকডোনাল্ড স্লগ ওভারে কখনও-সখনও বল করেন। মিডিয়াম পেস। বলের ওপর নিয়ন্ত্রণটা ভাল কিন্তু খুব একটা এফেকটিভ নন। আসলে ফিল্ডার হিসেবেই ওয়ান ডে ম্যাচে ওঁর কদর।

আবেদন মঞ্জুর হয়নি। ফার্স্ট স্লিপে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেন ম্যাক। বারবার তাঁর ছোট ভাই ভিক্টরের মুখটা চোখের সামনে ভেসে

উঠছে। কোনওভাবে তাঁকে যদি চাঁদে নিয়ে আসা যায়, হয়তো একটা স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পাবেন। একনজরে বোঝা যায় না যে, ভিক্টর ছেলেবেলায় পোলিওয় আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঠিক পা টেনে-টেনে হাঁটেন না, কিন্তু ট্রাউজারটা টেনে ধরলেই দেখা যায় ভাল পা-টা শীর্ণ। বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে বা হাঁটাচলা করতে পারেন না। চাঁদের ক্ষীণ মাধ্যাকর্ষণ···কল্পনাটা তো অলীক ঠিকই। কোনওদিনই হয়তো মানুষ এখানে বসবাসের সুযোগ পাবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে কী ঘটবে কে বলতে পারে। কয়েক মাস আগেও কি কেউ ভেবেছিল চাঁদের মাঠে এই ওয়ান ডে-র কথা। ভিক্টরের চাঁদে আসার ভাড়াটা যদি জোগাড় করতে হয় তবে আজকের 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কারটা ম্যাক-এর চাই-ই চাই। এবং বোধ হয় সেটা অসম্ভব নয়।

পৃথিবীর সেরা অফ স্পিনার ওয়াঙের প্রথম ওভারেই দুটো হিমালয় সাইজের ছক্কা আর তিনটে হেলাফেলা বাউন্ডারি।

যেন অতি-পরিচিত বোলারদের মোকাবিলা করছেন লুনার ব্যাটসম্যানরা। কাকে ঠিক কীভাবে শাস্তি দিতে হবে সেটা বুঝে নেওয়ার জন্য একটা বলও পর্যবেক্ষণ করেননি ওদের দু' নম্বর। আবির আশ্চর্য হয়ে যায়।

নাচার হয়ে ওরিলি ম্যাকের হাতে বল তুলে দেন। চার পা ছোট্ট ধীর রান-আপ থেকে ম্যাক তাঁকে প্রথম বলেই ক্লিন বোল্ড করে দিলেন এক নম্বর ওপেনারকে। একটা ওভারপিচ বল সোজা মিডল স্টাম্প ভেদ করে দিয়েছে। স্রেফ গতিতে পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটসম্যান।

পৃথিবীর দর্শকরা নড়েচড়ে বসেন। তার চেয়েও সাড়া পড়ে যায় ডান-ইয়ার কম্পানির স্পিড-চেক সিস্টেমের কর্মীদের মধ্যে। বলটার গতি ছিল নব্বই। হিসেবে কি ভুল হল!

ভুল যে হয়নি সেটা শুধু পরবর্তী পাঁচ বল নয়, খেলার ফলাফল থেকেও কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল।

প্রথম ওভারেই দুটো উইকেট নিয়েছেন। তাঁর দুরন্ত গতি এবং ব্যাটসম্যানের শরীর টিপ করে পাঠানো ওভারপিচ বলগুলোর মোকাবিলা করার মতো নৈপুণ্য চাঁদের ব্যাটসম্যানদের নেই।

এখন শুধু লক্ষ করা অন্য প্রান্তের বোলাররা কী করেন।

ম্যাকের বিপরীত প্রান্তের বোলারদের কাছ থেকে ওভারপিছু গড়ে বারো রান করে সংগ্রহ করেও জিততে পারল না লুনার ইলেভেন।

বিনা উইকেটে ছেষট্টি থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ অল ডাউন। একা ম্যাক আঠারো ওভার তিন বলে মুড়িয়ে দিলেন লুনার ইলেভেনকে। ম্যাকের বোলিং হিসেব ৬·৩ ওভার, ৩ মেডেন, ৭ রান, ৯ উইকেট। জীবনের সেরা কৃতিত্ব তো বটেই।

ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার বন্টন অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেন ওরিলির অনুপস্থিতিটা কেউই খেয়াল করেননি। কিন্তু করা উচিত ছিল। তা হলে মনে পড়ে যেত ম্যাকের দ্বিতীয় ওভার শেষ হওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে ওরিলির বচসার কথা।

"তুমি এরকম করলে আর কিন্তু বল করতে দেব না।" বলেছিলেন ওরিলি, "ইউ কান্ট ডু দিস!"

উত্তরে শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন ম্যাক। ভাল করেই জানতেন এই পরিস্থিতিতে তাঁকে বল করতে না দেওয়ার ক্ষমতা কোনও দলনায়কেরই নেই।

ম্যাক তৃতীয় ওভার শুরু করার আগেই ওরিলি সহ-অধিনায়কের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে এসেছিলেন।

ম্যাকের বোলিংয়ের দাপট এসব তুচ্ছ ঘটনাকে কোথায় উড়িয়ে দিয়েছে!

॥ ১৮ ॥

চাঁদের কক্ষপথ ত্যাগ করে একে-একে সব ক'টি জাহাজ এখন ঘরে ফেরার পথ ধরেছে। হঠাৎ একসঙ্গে সব মহাকাশযানের সঙ্গে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রগুলির টেলিকমিউনিকেশন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য যাত্রীরা সে-কথা টেরও পাননি। পাওয়ার কথাও নয়। কিন্তু এবার কামরার অভ্যন্তরে মাইক্রোফোন অচল হয়েছে। আচমকা থেমে গেছে নরম ও তরল সঙ্গীত। একটি নম্র অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ উচ্চারণ সবাইকে তটস্থ করে দিল।

"চাঁদের দেশের তরফ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছি। শুভযাত্রা। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে আপনাদের সঙ্গে এই সংযোগ স্থাপনের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কয়েকটি তথ্য আপনাদের স্বার্থেই জানানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।"

অজানা আতঙ্কে যাত্রীরা সিঁটিয়ে বসেছেন। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা অকেজো করে দিয়েও মহাকাশতরীর প্রযুক্তিবিদরা চাঁদের ঘোষকের গলা টিপে ধরতে পারেননি।

"প্রথমেই আপনাদের অভিনন্দন জানাই এক ঐতিহাসিক ও গৌরবময় বিজয়ের জন্য। নিজেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা এত নিশ্চিত ছিলাম যে, এই পরাজয় আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এরকম অপ্রত্যাশিত কিছু পাওয়ার আশাতেই তো পৃথিবীর জীবন্ত

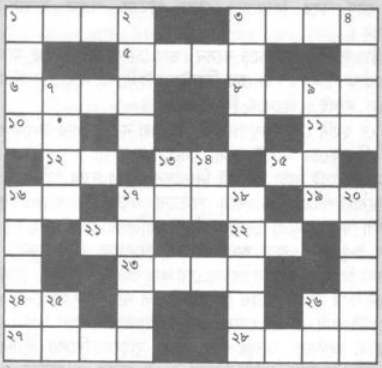

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) আকাশের জমাট নক্ষত্রপুঞ্জ। (৩) অকপট। (৫) বৃক্ষ। (৬) বর্ষার মেঘ এমন, আবার সন্দেশও এমন হয়। (৮) সপ্তপাতালের সবচেয়ে নীচেরটি। (১০) নতুন। (১১) কোনও নগরই একদিনে তৈরি হয় না, কিন্তু প্রবাদটা এই নগর নিয়েই। (১২) রবীন্দ্রনাথের 'নকল গড়' কবিতার নায়ক। (১৩) বাচ্চা, ছানা। (১৫) ভারতের একটি রাজ্য, যার নিসর্গশোভা অপরূপ। (১৬) চমৎকার, পোশাক। (১৭) অট্টালিকা। (১৯) বিভাজ্য অঙ্ক। (২১) কুৎসা। (২২) দড়ি। (২৩) উপাসিকা। (২৪) রাগে গা যেমন করে। (২৬) '— পোড়া মড়া দাহ' এমন বাংলাই তো গুরুচণ্ডালী। (২৭) উৎসর্গ, প্রদান। (২৮) খালি-পা।

উপর-নীচ : (১) আরতি। (২) ফলবিশেষ। (৩) নিত্য, প্রত্যহ। (৪) যে-কলম অন্যের হয়ে সই করে। (৭) বিখ্যাত দুই ভাই। (৯) ধারালো অস্ত্রবিশেষ। (১৩) প্রদীপ। (১৪) দেবদেবী বা গুরুজনের কাছ থেকে লব্ধ অনুগ্রহ। (১৬) যার কোনও দাবিদার নেই। (১৭) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প। (১৮) কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামভক্ত রাক্ষসপুত্র। (২০) অনুগত। (২৫) কুড়ি দিস্তায় এক।'(২৬) বড় মাদুরবিশেষ।

গত সংখ্যার সমাধান

মানুষদের কাছে যেতে চেয়েছিলাম আমরা।

"হ্যাঁ, আপনারা জীবন্ত মানুষ আর আমরা সব উন্নতি সত্ত্বেও রোবট—যন্ত্রমানুষ। বহুকাল আগে, পৃথিবী যখন অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করার উপক্রম করছে, চাঁদের পিঠে দেশান্তরী পৃথিবীর মানুষরা আমাদের সৃষ্টি করেন। তাঁদের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য বহনের ভার আমাদের হাতে দিয়ে বহুকাল আগেই তাঁরা প্রয়াত হয়েছেন। দুঃখের কথা, বছর দশেক আগে আমরা কিন্তু ভিন্ন নক্ষত্রলোক থেকে অক্সিজেন সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তাঁরা তো আর নেই। কিন্তু আপনারা আছেন। আমরাও আছি। আমাদের সভ্যতা কিন্তু একটা স্তরে পৌঁছবার পর থমকে গেছে। আর এগোতে পারছি না আমরা। মনে রাখবেন, কারিগরি বা বৈষয়িক দিক থেকে পৃথিবীর চেয়ে কিন্তু আমরা অনেক বেশি অগ্রসর। তা সত্ত্বেও, একটা কানাগলির শেষে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারলাম, জীবন্ত মানুষের সাহায্য ছাড়া এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। তখনই আমরা আপনাদের সঙ্গে আবার সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করি।

"আপনারা জানেন না, কিন্তু এই ক্রিকেট ম্যাচে জেতবার জন্য আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি। এমনকী আমাদের চর মারফত পৃথিবী থেকে বিভিন্ন যুগের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য, ইতিহাস, এমনকী দুর্লভ ও নিষিদ্ধ ভিডিও ক্যাসেট অবধি সংগ্রহ করা হয়েছে। আপনাদের প্রত্যেক খেলোয়াড়—যাঁরা আজ এসেছিলেন—সবাইকার দুর্বলতা আমরা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তৈরি হয়েছিলাম। তবুও আপনারা আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন। তাতে আমাদের কোনও দুঃখ নেই। বরং আমরা খুশি। কারণ এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষের সংস্পর্শে না থাকলে আমাদের পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

"ধন্যবাদ, মানুষ ! শুধু একটা কথা জানিয়ে দিই, আমরা নিজেদের স্বার্থেই আপনাদের মধ্যে থেকে শ'খানেক লোককে আটকে রেখেছি। এবং তাঁদের বদলে ডামি পাঠিয়ে ধোঁকা দিয়েছি আপনাদের। দিন সাতেকের মধ্যেই তাঁদের আমরা ফিরিয়ে দেব পৃথিবীতে। শুভযাত্রা ! শুভযাত্রা !"

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর বিশ্ব-একাদশের ক্যাপ্টেন ওরিলি তাঁর রিপোর্ট এবং ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত একসঙ্গে পেশ করলেন।

অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হওয়ার খবর সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। চেপে যাওয়া হয়েছে শুধু তার রিপোর্ট "ম্যাক অর্থাৎ ম্যাকডোনাল্ডের চাকিংয়ের জন্যই লুনার একাদশ পরাজিত হয়েছে। তিনি কন্‌ই ভাঁজ করে বল ছুঁড়েছেন। কিন্তু পরনে মহাকাশের পোশাক থাকার জন্য সেটা ধরা পড়েনি, আম্পায়ারও আপত্তি জানাননি। পদার্থবিদরা একটু হিসেব করলেই ধরতে পারবেন যে, এ ছাড়া চাঁদের মাঠে কেউ ওই গতিতে বোলিং করতে পারেন না।"

বিশ্বের প্রথম সারির রাজনীতিকরাই শুধু ওরিলির রিপোর্ট পড়েছেন। কিন্তু তাঁদেরও মাথায় কোনও দুশ্চিন্তা ভর করেনি। রোবট মানে রোবটই। ক্রিকেট বলতে যাঁরা অভিধান খুলে দেখেছেন, ন্যায়সঙ্গত খেলা এবং বিশ্বাসও করেন, সেখানে কোনও দুর্নীতির ঠাঁই নেই।

এরকম সরল বিশ্বাসী অ-মানুষদের ভয় পাওয়ার কি কোনও কারণ থাকতে পারে ! (সমাপ্ত)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

এই, তুমি হোস কেটে দিয়েছ !
?
ধরা পড়েছি, চিফ ! চলুন, পালাই !
ও হোস কাটল কেন···
!
ভৌ ভৌ রেখে কী হয়েছে বলো !
ভৌ !
ও কিছু বলতে চায়··· সর্বনাশ ···তবে ভেতরে কি কেউ আছে ?
ভৌ !
বরং ভাল করে খুঁজে দেখা যাক···
ভৌ !
ভৌ !
ভৌ !
ও ফিরে আসছে না কেন ?

কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
এক 'কুটিল বেড়াল' !
ম্যাও !
আদিকালের এক ছেলেভুলনো ছড়ার সূত্রে ব্যাটম্যান আর রবিন শয়তান কুটিল মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে 'কুটিল মানুষ' আর তার দলের হাতে এক পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গপথে বন্দী । সেখানে তারা দেখল--
জটিল কেস ! কুটিল মানুষ দেখলাম--কুটিল পথে হেঁটে পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গপথের কুটিল সিঁড়িতে কুটিল সিকি পেলাম । সেটা কুটিল মানুষ ছিনিয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে আমাদের বন্দী করল, আর হঠাৎ হাজির হল খোঁড়া বেড়াল ! এর পরে কী ?
আয়--আয়--মেনি, আয় !
মানুষের গলা--পেছন দিক থেকে আসছে !
বেড়ালটা পালাচ্ছে ! ওর পিছু নেব ! ও আমাদের বাইরে নিয়ে যাবে, নয় নতুন বিপদে ফেলবে !
লক্ষ্মী মেনি, এদিকে আয় !
আয় মেনি, এখানে আয় !
ম্যাও ! ম্যাও !
আরে--ব্যাটম্যান আর রবিন ! জানতাম এখানে পাব !
ব্যাটম্যান ! সেই মুমরা লোকটা !
কুটিল মানুষ যাকে খুন করেছে ভেবেছিলাম !
না--ওর গুলি আমার গায়ে লাগেনি ! আমি মরার ভান করেছিলাম--তোমরা ওর পেছনে ছুটলে আমি উঠে পালিয়ে গিয়ে এখানে লুকিয়ে আছি !
তাই তো দেখছি--কিন্তু বেড়ালটা--
কুটিল মানুষের বেড়াল, কিন্তু আমাদের ভাব হতে হবে ! তোমাদের ছেড়ে দিতে যাওয়ার সময় ও পালায় ! ভেবেছিলাম তোমাদের উপকার করলে তোমরাও করবে, তাই না ?
খেমো না--বলে যাও !
সিকির রহস্য জানার আগে আমি কুটিল মানুষের দলে ছিলাম । সিকিটায় গোপন চিহ্ন আছে, বুঝলে ! এক ইংরেজ আমেরিকায় এসে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিল । সিকিতে তার গোপন সঙ্কেত আছে--
ইংরেজের বাড়িতে গুপ্তধন পোঁতা আছে । কুটিল মানুষ সেখানেই গেছে ! তোমরা আমাকে গুপ্তধন পেতে সাহায্য করলে আধাআধি বখরা দেব, রাজি ?
কুটিল মানুষকে পেলে সবকিছুতেই রাজি !
কথা পাকা ! আচ্ছা, তোমার বন্ধুরা কি তোমাকে ইঁদুর বলে ডাকে ?
হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কী করে ?
আমি মনের কথা পড়তে জানি ! পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো, ইঁদুর ! বাজি রাখতে পারি বাড়িটা কুটিল !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

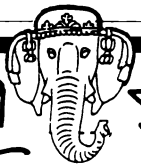

সোনার গনপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

দোকানদার বলল, "তোমরা কারা ?"

পক্ষী বলল, "ওরা আমার বন্ধু। জঙ্গলে বেড়াতে এসেছে।"

"তা এই গরমে ওই পোশাকগুলো কেন পরিয়েছ বন্ধুদের ?"

"ওদের শখ হয়েছে খুব পরবার। তাই।"

"বেশ, বেশ। তা ওদের তা হলে খনি দেখিয়ে আনো। চুনা পাথরের খনিটা অন্তত দেখুক।"

"বুনোর সঙ্গে দেখা যখন হল না তখন ওই দিকেই নিয়ে যাব। তারপর দেখিয়ে আনব ডুলুং নদীর উৎসটা।"

দোকানের ভেতরে বেঞ্চিতে বসে শক্ত-সমর্থ দু'জন যুবক তখন চা খাচ্ছিল। তারা আড়চোখে একবার এদের দেখেই চায়ের দাম দিয়ে সুট করে কেটে পড়ল। তারপর দোকানের বাইরে গিয়ে চাপা গলায় নিজেদের ভেতর কী সব আলোচনা করে হারিয়ে গেল গহন বনের অন্তরালে।

।। তেরো ।।

এই হল ঠাকরুনপাহাড়ি। আতঙ্কের, সৌন্দর্যের এবং কল্পনার। এর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিন্নিরাও দোকান থেকে বেরিয়ে এসে পক্ষীর সঙ্গে এগিয়ে চলল পর্বতাভিযানে। এই পাহাড় ডিঙিয়ে আর-একটা যে পাহাড়, সেই পাহাড়েই নাকি শয়তানের ঘাঁটি। ইতিমধ্যে চুনা পাথরের খনির কাছ থেকে একদঙ্গল আদিবাসী ছেলে এবং কয়েকটি কুকুর ওদের দলে ভিড়ে গেছে। এই ছেলেগুলোর সকলেই পক্ষীর খুব পরিচিত।

এখন ওরা দলবদ্ধ হয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। সে কী দারুণ হইচই, আর আনন্দ।

তিন্নি বলল, "পক্ষী, আর আমাদের এই সাজ পরে থাকার দরকার কী ?"

পক্ষী বলল, "বাঃ রে, এইবারই তো আমরা আসল জায়গায় যাচ্ছি। এইগুলো পরে থাকলে ওরা তোমাদের চিনতে পারবে না। ভাববে, আমাদেরই কেউ পরেছে শখ করে।"

ওরা প্রথমেই যে ছোট্ট পাহাড়টায় উঠল, তার নাম ঠাকরুনপাহাড়। এই পাহাড়ের নামেই গ্রামের নাম। এই পাহাড়ে ওঠার পথ নেই। সরু ফিতের মতো একটি পথ আগাছায় ঢেকে আছে। তাই ওরা বহু কষ্ট করে গাছের ডাল ধরে লতাগুল্ম মুঠো করে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে ওপরে উঠল। অবশ্য সকলের আগেই উঠে পড়ল সঙ্গী সেই কুকুরগুলো। এদের চেয়ে ওদের উৎসাহ যেন আরও বেশি। বেশ কিছুটা উঠেছে এমন সময় আচমকা একটি কর্কশ ডাকে শিউরে উঠল ওরা। ওরা মানে বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর।

শুভঙ্কর বলল, "কিসের ডাক ওটা ?"

পক্ষী বলল, "ময়ূরের।"

আনন্দে নেচে উঠল শুভঙ্কর। ময়ূর তো ও চিড়িয়াখানাতেই দেখেছে। সেই ময়ূর এই প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে ! মুক্ত পরিবেশে ! এ যে কল্পনারও অতীত। শুভঙ্কর বলল, "কই ! কোথায় ময়ূর !

আমাকে দেখাও না ভাই ?"

"সে এখন কোথায় কোন গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে তা কে জানে ? এভাবে তো ওদের দেখা পাওয়া মুশকিল।"

একটি আদিবাসী ছেলে হঠাৎই গাছের ডালে একটি ময়ূর দেখে লাফিয়ে উঠল, "ওই, ওই তো।" বলেই পক্ষীর হাত থেকে তীর-কাঁড় নিয়ে মারতে উদ্যত হল।

পক্ষী সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিল তাকে বলল, "করিস কী ! ময়ূর মারা বারণ, জানিস না ? এক্ষুনি পুলিশ এসে যাবে।"

শুভঙ্কর কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেই ময়ূরকে দেখতে পেল না। তবে হঠাৎই যা দেখল তা দেখবে বলে ও স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি। কোথা থেকে যেন আর-একটা ময়ূর উড়ে এসে পাহাড়ের একটি উঁচু পাথরে বসে পেখম মেলে একপাক ঘুরে নিল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়েই একটা সাপ মুখে নিয়ে আবার উড়ে বসল গাছের ডালে।

ময়ূর দেখে ওরা আরও একটু ওপরে উঠতেই দেখতে পেল ডুলুং নদীর সেই উৎসটা। একটি নির্মল জলধারা পাহাড়ের একটি ফাটল থেকে কুলকুল করে স্বচ্ছন্দ গতিতে কেমন নেচে-নেচে বেরিয়ে আসছে।

এখানেও পাহাড় ও বনানী ওদের চোখে অপরূপ হয়ে উঠল। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এক-একটি পাথরের ওপর বসে পড়ল এক-একজনে। কুকুরগুলো নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করতে লাগল।

পক্ষী বসল সবচেয়ে বড় পাথরে, উঁচুতে বসে বিল্টু, তিন্নি আর শুভঙ্করকে বলল, "এই হচ্ছে ঠাকরুনপাহাড়। পাহাড়ের নীচে গ্রাম। আর পেছনের বনবাদাড়ে ভরা ওই পাহাড়গুলোর গুহাতেই আমাদের অভিযান করতে হবে। ওইখানে অনেক ছোট-ছোট গুহা আছে। সচরাচর কেউ যায় না। যাওয়ার কোনও পথও নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "তা হলে আমরা যাব কী করে ?"

"কষ্ট করে যেতে হবে। গাছপালার ডাল ধরে। পাথরের খাঁজে ভর করে।"

তিন্নি বলল, "ওখানে কেউ যায় না কেন ? যাওয়ার পথ তৈরি হলে তো ভারী চমৎকার বেড়ানোর জায়গা হতে পারে ওগুলো।"

"পথ অবশ্যই আছে। তবে কিনা বর্ষার ফলে অনেক আগাছা গজিয়েছে চারদিকে। তাই সে পথ ঢাকা পড়ে গেছে। বিশেষ করে ওই জায়গাগুলো দুষ্কৃতীদের ঘাঁটি বলে স্থানীয় লোকজন এড়িয়ে চলে জায়গাগুলো। তাই জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনে গাছ কাটতেও কেউ যায় না। তবে আমরা যে যাইনি কখনও বা যাই না, তা নয়।"

"তোমাদের কিছু বলে না ওরা ?"

"বিশেষ কিছু বলে না। তবে অচেনা লোক গেলে রক্ষে নেই। কোথা থেকে যে লুকিয়ে গুলি করবে, তা টেরও পাবে না কেউ।"

শুভঙ্কর বলল, "তা হলে আমরা যাব কী করে ? যদি ওরা আমাদের দেখে গুলি করে ?"

অন্য ছেলেরা বলল, "হ্যাঁ, করুক না গুলি। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব না। তীর মেরে চোখ-মুখ ফুটো করে দেব।"

শুভঙ্কর, বিল্টু ও তিন্নি চোখে-চোখে পরস্পরকে একবার দেখে নিল। শুধু জঙ্গল শের তো নয়, এই মুহূর্তে ওদের মনে পড়ে গেল শিকারি বাজের কথা। এইরকমই কোনও একটি পরিত্যক্ত গুহার জঠরে নিশ্চয়ই ওর পাপার্জিত অর্থ, সম্পদ লুকনো আছে এবং লুকিয়ে আছে নিজেও। কিন্তু মউ ? মউকেও কি জঙ্গল শের ওইরকম কোনও একটি গুহায় সত্যিই বন্দী করে রেখেছে ? এ-রহস্যের সমাধান চাইই-চাই। আর সেইজন্যই তো এত কষ্ট করে এখানে আসা। তাই দারুণ কৌতূহলী হয়ে বলল, "আমরা ওখানে যাবই। যত কষ্টই হোক, তবু যাব। দেখব ওই পাহাড়ের গায়ে গুহা আছে। এতদূর এসে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না।"

পক্ষী ওর দলের ছেলেদের বলল; "দ্যাখো ভাই, আমাদের এই বন্ধুরা কিন্তু কখনও এ-পথে আসেনি। এমনকী পাহাড় কাকে বলে তাও জানত না এতদিন। আজ এরা শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের বন্ধু। তাই আমাদের উচিত এদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।"

সবাই বলল, "হ্যাঁ, উচিত তো।"

"কিন্তু এদের কোনও ক্ষতি হলে আমাদের দারুণ বদনাম হয়ে যাবে।"

"এদের কোনও ক্ষতিই হবে না। আমরা থাকতে কেউ ওদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা আগে-আগে থাকব, ওরা থাকবে পেছনে। মরলে আমরাই আগে মরব।"

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিড়াল আঁকো

একটি বিড়াল এঁকেছি, সঙ্গে আরও একটি বিড়ালের মুখ। তোমরা নতুনভাবে দু-একটি বিড়াল আঁকার চেষ্টা করো। দেখবে আঁকতে গিয়ে দারুণ ভাল লাগবে। পারলে আরও বেশি বিড়ালও এঁকে ফেলতে পারো।

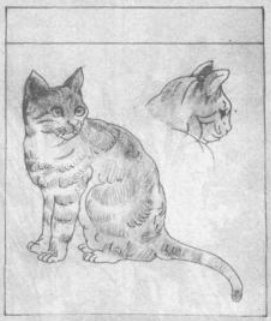

হাসিখুশি — শতদল

বুবলি, তোমার ভাই কি কথা বলতে শিখেছে ?

বুবলি : ওর কথা বলবার তো দরকারই হয় না। একটু কাঁদলেই ও সব ভাল ভাল জিনিস পেয়ে যায়।

দিদিমণি : সরীসৃপ হল এমন এক ধরনের প্রাণী যা পেটে ভর দিয়ে চলে। কেউ একটা উদাহরণ দিতে পারো ?

বুবুন : আমার ছোট ভাই !

মা : একটা পাউরুটিতে অতখানি জ্যাম আর মাখন একসঙ্গে লাগিয়ে খাচ্ছ রিনটিন ?

রিনটিন : আমি তো খরচ বাঁচাচ্ছি মা, দুটো পাউরুটির বদলে একটা পাউরুটি খেয়ে।

দিদিমণি : বলো তো রোদ ঝকঝকে দিনে আমরা মাথার ওপর কী দেখতে পাই ?

বুবলি : নীল আকাশ।

দিদিমণি : আর বাদলার দিনে ?

বুবলি : ছাতা !

ছবি : দেবাশিস দেব

পক্ষী বলল, "এবার তা হলে জেনে রাখো, আমরা ওখানে এতজন গেলে ওরা কিন্তু ভয় পেয়ে আক্রমণ করতে পারে।"

"ওরা আক্রমণ করলে আমরাও পালটা আক্রমণ করব। তীর ছুঁড়ব। পাথর ছুঁড়ব।"

"যদি ওরা গুলি করে?"

"আমরা একজন কি দু'জন মরব। কিন্তু ওরা সবাই মরবে।"

"ঠিক আছে। এবার তবে তোমাদের আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি, যা শুনলে তোমরা সবাই রেগে যাবে ওই শয়তানগুলোর ওপর।

"আমাদের এই বন্ধুদের দলের একটি মেয়ে নিখোঁজ। ওই গুহাগুলো দেখতে যাওয়ার ছলে আমরা ওখানে তার খোঁজ করব।"

"সে যে ওখানেই আছে তার ঠিক কী?"

তিন্নি বলল, "থাকলে সে ওখানেই থাকবে। তার কারণ, সে তো নিজে থেকে নিখোঁজ হয়নি। একজন লোক জোর করে তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের এক বন্ধুকে সে লাথি মেরে ভুলুং এ ফেলে দিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি তার নাম বুনো। তোমরা কি তাকে চেনো?"

ছেলেরা বলল, "হ্যাঁ,হ্যাঁ, চিনি বইকী। ওই তো পাহাড়ের নীচে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওই ঘরটা তার। কিন্তু সে তো এখানে নেই। আজ ক'দিন হল সে কোথায় গেছে। আমরা কেউ দেখিনি তাকে।"

পক্ষী বলল, "সেইজন্যই আমরা সন্দেহ করছি সে নিশ্চয়ই পুলিশের ভয়ে ওই পাহাড়ের গুহার ভেতরে লুকিয়ে আছে।"

ছেলেরা বলল, "তা অবশ্য থাকতে পারে।"

তিন্নি বলল, "এ ছাড়া সে ওকে রাখবেই বা কোথায় বলো? তাই তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে চলো, যদি খুঁজে পাই মেয়েটিকে।"

ছেলের দল প্রচণ্ড কলরবে হইহই করে এগিয়ে চলল। সকলের আগে-আগে কুকুরগুলো। তাদের পেছনে বীর-বিক্রমে ছেলের দল। কুকুরগুলো যেন বুঝতে পেরে গেছে কোথায় তাদের যেতে হবে। এদের চেয়েও ওদের উৎসাহ যেন আরও বেশি।

ছেলের দলের মধ্যমণি পক্ষী রইল সকলের আগে। তার পেছনে বাকি ছেলেরা। সবার পেছনে বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর। পক্ষী ছাড়াও এই ছেলেদের দু-একজনের কাছে তীর-কাঁড় ছিল। ওরা এখন এমনই মারমুখী যে, এই সময় হঠাৎ করে ওদের সামনে কেউ এসে পড়লে তার বুঝি আর রক্ষে নেই।

ওরা এই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যখন আসল পাহাড়ের খানিকটা উঠেছে তেমন সময় ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে সেই দুই আদিবাসী তরুণ, যারা চালাঘরের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল, তারা বেরিয়ে এল। তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে ভীষণ মূর্তিতে এমনভাবে এগিয়ে এল যে, দেখলে বুক শুকিয়ে যায়।

শুভঙ্কর, বিল্টু ও তিন্নিকে দেখে ছেলের দল থমকে দাঁড়াল। কুকুরগুলো গরগর করতে লাগল রাগে। ওরা ধমক দিয়ে বলল, "খবদার, এক পা-ও এগোবি না কেউ।"

পক্ষী বলল, "পথ ছাড় বিশাল। আমরা শিকারে যাচ্ছি, আমাদের যেতে দে।"

পক্ষীর অমন ভয়ঙ্কর মূর্তি আগে কেউ দেখেনি। এইটুকু ছেলে, কী তার রোখ। যেন কেউটের বাচ্চা ফণা তুলেছে।

বিশাল বলল, "তোদের সঙ্গে ওই তিনজন কে?"

"তাতে তোর দরকার কী?"

আর-এক তরুণ, তার নাম চম্পক। বলল, "ওদের বল, ওই সাজা পোশাকগুলো খুলে ফেলতে। আমরা দেখব ওর ভেতরে কারা আছে।"

পক্ষী বলল, "না। ওরা খুলবে না।"

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর—তিনজনেই তখন আত্মপ্রকাশ করল।

বিশাল বলল, "তোরা কারা! এই অঞ্চলে কখনও তো দেখিনি তোদের। বেশ ভাল ঘরের ছেলেমেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। এখানে এই জঙ্গলে কী করতে এসেছিস?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা পাহাড় দেখতে এসেছি।"

"কে পাঠিয়েছে তোদের?" বিশাল অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল পক্ষীর দিকে। (ক্রমশ)

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দক্ষিণের এক প্রদেশে গৃহযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ

ইতিহাসে বিখ্যাত আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

দাসপ্রথা কি তুলে দেওয়া হবে ? উত্তরের রাজ্যগুলির সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নয় দক্ষিণের রাজ্যগুলি । এই নিয়েই আমেরিকায় শুরু হয়েছিল গৃহযুদ্ধ ।

দক্ষিণের এগারোটি রাজ্য বনাম যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, ইতিহাসে তা 'আমেরিকার গৃহযুদ্ধ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে । দাসপ্রথার অবসান এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলি এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সব রাজ্যের সিদ্ধান্ত না মেনে স্বাধীনভাবে নিজস্ব কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি না সেই প্রশ্নেই শুরু হয়েছিল এই বিবাদ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ বনাম উত্তরের রাজ্যগুলির মধ্যে ঘরোয়া এক বিবাদ ।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশ জমাট বাঁধতে শুরু করেছিল । ১৮৬০ সালের নির্বাচনে আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাও বুঝিয়ে দেয় আমেরিকার সাধারণ মানুষের মতামতের হাওয়া এদিকেই বইছে । মার্কিন জনসাধারণও আর মেনে নিতে পারছেন না জঘন্য এই প্রথা । স্বাধীনতার সময়ে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই সমান ।' এই ক্রীতদাসপ্রথা স্বাধীনতার সেই ঘোষণার সঙ্গে একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ ।

স্বাধীনতার সময়ে একদিকে এই ঘোষণা করা হয়েছিল, অন্যদিকে সংবিধানে লেখা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব রাজ্যই তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । ১৮৬০ সালের শেষে দক্ষিণের এগারোটি রাজ্য ঠিক করল তারা এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে নতুন এক যুক্তপ্রদেশ গঠন করবে । জেফারসন ডেভিস হবেন সেই যুক্তপ্রদেশের প্রেসিডেন্ট । দক্ষিণের রাজ্যগুলির এই হাঁকডাকের জবাবে উত্তরের রাজ্যগুলিও নির্দ্বিধায় জানাল কোনওমতেই এই যুক্তরাষ্ট্রকে ভাঙা চলবে না । শুরু হল গৃহযুদ্ধ ।

ক্রীতদাসরা স্বাধীন হবে কি না এই প্রশ্নে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল, তা এবার ঘুরে গেল অন্যদিকে । দক্ষিণের রাজ্যগুলির সম্মিলিতভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে কি না ।

১৮৬১ সালের ১২ এপ্রিল । দক্ষিণের যুক্তপ্রদেশই প্রথম আক্রমণ শুরু করল । চার্লসটন বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের সামটার দুর্গের দিক লক্ষ্য করে শুরু হল গুলি ছোড়া । চার বছর ধরে এই যুদ্ধে দু' পক্ষই ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অন্যের ওপর, বিশাল এক সৈন্যসম্ভার নিয়ে । এর আগে অন্য কোনও যুদ্ধে এত বিপুল সৈন্যসমাবেশ দেখা যায়নি ।

সুবিধেটা অবশ্য উত্তরের যুক্তরাষ্ট্রই বেশি পেয়েছিল । দক্ষিণের তুলনায় সেখানে জনসংখ্যা অনেক বেশি, অর্থনৈতিক অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল ।

উত্তরের জাহাজগুলি একে-একে এসে অবরোধ করে দিল দক্ষিণের সব বন্দর । আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য দক্ষিণের এই রাজ্যগুলি তুলো রফতানির ওপর নির্ভরশীল, সেই রাস্তাটা তারা এভাবে বন্ধ করে দেবে । একের পর এক রক্তাক্ত, ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পালা শুরু হল । গ্যাটিসবার্গের যুদ্ধ এদের মধ্যে অন্যতম । ১৮৬৩ সালের ১ জুলাই থেকে ৩ জুলাই অবধি এই যুদ্ধ চলেছিল । এই যুদ্ধের সময়েই গণতন্ত্র নিয়ে লিঙ্কন তাঁর সাড়া-জাগানো ভাষণটি দিয়েছিলেন, ইতিহাসে আজও তা 'গ্যাটিসবার্গ-বক্তৃতা' নামে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে । কিন্তু কোনও পক্ষই শেষ অবধি চূড়ান্ত জয়ে পৌঁছতে পারল না ।

দক্ষিণের দুই জাঁদরেল সেনানায়ক রবার্ট লি ও টমাস জ্যাকসন এই যুদ্ধে প্রথম থেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । পক্ষান্তরে, উত্তর তার সেনানায়কদের খুঁজে পেয়েছিল একটু দেরিতে । টমাস, শেরিডান, শেরম্যান, ইউলিসিস গ্রান্ট (পরে ইনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন) প্রমুখ যোদ্ধারা উত্তরকে দিয়েছেন নেতৃত্ব, শেষ অবধি এনে দিয়েছেন বিজয় ।

১৮৬৪ সালে শেরম্যান এগিয়ে গেলেন জর্জিয়ার মধ্য দিয়ে, ধ্বংস করে দিলেন গোটা দক্ষিণের সাপ্লাই লাইন । অন্যদিক দিয়ে গ্রান্ট পৌঁছলেন দক্ষিণের তথাকথিত রাজধানী রিচমণ্ড শহরে । একদিকে শেরম্যানের সেনাদল, অন্যদিকে গ্রান্ট—জবরদস্ত এই সাঁড়াশির চাপে পড়ে শেষ অবধি নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল দক্ষিণ । ১৮৬৫ সালের ৯ এপ্রিল অ্যাপোমাটস-এ দক্ষিণের বাহিনী আত্মসমর্পণ করল ।

শেষ হয়ে গেল ক্রীতদাসদের যুগ । কিন্তু যুদ্ধের পর আবার পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনের কাজ বিজয়ী উত্তরের রাজ্যগুলি ভালভাবে করতে পারেনি । পেছনে রয়ে গেছে তখন অনেক তিক্ততা । সাদা এবং কালো এই দুই বর্ণের মানুষের মধ্যে অমানবিক সম্পর্কের তিক্ততা ।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) কোন বক্সারের ডাকনাম ব্রাউন বম্বার ? **সুদীপ মৈত্র**, উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় ।
(২) কে প্রথম ব্যাটারি তৈরি করেছিলেন ? **সুমন রায়**, বর্ধমান ।
(৩) 'পৃথিবীতে পাপ বলে যদি কিছু থাকে, তা হল দুর্বলতা ।'—কে বলেছিলেন এই কথা ? **কৌশিক মিত্র**, কোন্নগর, হুগলি ।
(৪) ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীর নাম কী ? **শুভস্মিত গোস্বামী**, রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি ।
(৫) 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' গ্রন্থটি কার লেখা ? **ইসমত, জিনাত ও ইতেসহাম আজুম**, কলকাতা-১৬ ।
(৬) 'প্রিজন ডায়রি' বইটির লেখক কে ? **মুরারিমোহন রক্ষিত**, বর্ধমান ।
(৭) ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কী ? **কিংশুক গুপ্ত**, ঝাড়গ্রাম ।
(৮) কলকাতার চ্যাপলিন সিনেমা হলের আগের নাম কী ছিল ? কবে এই নাম পরিবর্তন হয় ? **প্রান্তিক সান্যাল**, কলকাতা-২৬ ।
(৯) 'দ্য সোর্ড অব টিপু সুলতান' নামের জনপ্রিয় টি· ভি· সিরিয়ালটি কোন লেখকের উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ? **বিক্রম অধিকারী**, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ।
(১০) সংবাদসংস্থা পি· টি· আই-এর পুরো নাম কী ? **কমল সিওয়া**, জলপাইগুড়ি ।
(১১) 'রসেবশে' বইটি কার লেখা ? **সৌম্যদীপ নাগ**, বাঁকুড়া ।
(১২) 'নেহরু স্কোয়ার' কোথায় অবস্থিত ? **অয়ন দে**, ঠাকুরপুকুর ।
(১৩) 'রিদম অ্যান্ড সুইং' বইটি কার লেখা ? **তুলি প্রামাণিক**, ভবানীপুর ।
(১৪) নাগাসাকি শহর জাপানের কোন দ্বীপে অবস্থিত ? **অর্পিতা সরকার**, কাঁচরাপাড়া ।
(১৫) ভারতে ক'টি ব্রহ্মমন্দির আছে এবং কোথায় ? **বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী**, রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর ।
(১৬) 'মেরি অ্যান ইভান্স' কী নামে বিখ্যাত ? **কল্পশ্রী ভৌমিক**, শিলচর, আসাম ।
(১৭) কোন দেশের জাতীয় পতাকায় সেই দেশের মানচিত্র আঁকা আছে ? **রিন্টু সাঁই**, পাল্লা রোড, বর্ধমান ।
(১৮) ভলকান কত বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ? **সংযুক্তা হালদার**, বৈদ্যবাটী, হুগলি ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব । বর্তমানে এটি ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাব নামে পরিচিত ।
(২) ৭৮ মিটার ।
(৩) জিতেন্দ্র ।
(৪) গ্রেগ চ্যাপেল ।
(৫) ননসেন্স ক্লাব ।
(৬) ওয়াক্‌সম্যান ।
(৭) ভিক্টর ভার্স্টার ।
(৮) পাকিস্তানের আসিফ ইকবাল ।
(৯) কিটো ।
(১০) মহম্মদ সাঈদ ।
(১১) অল ইন্ডিয়া শিখ স্টুডেন্টস ফেডারেশন ।
(১২) জর্জ ওয়াশিংটন ।
(১৩) সুনীল গাওস্কর ।
(১৪) জার্মান চিরুনি কোনও বিশেষ চিরুনি নয় । হাতের আঙুলের আর-এক নাম জার্মান চিরুনি ।
(১৫) গাড়িতে । ড্রাইভারের পায়ের সামনে অ্যাকসিলারেটর, ব্রেক, ক্লাচ ইত্যাদি নিয়ে যে ফাঁকা জায়গা, তারই নাম ফুটওয়েল ।
(১৬) দশ নম্বর । থ্যাচারের বাড়ির ঠিকানা ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট, মারাদোনার জার্সির নম্বর ১০, বো ডেরেকের বিখ্যাত ছবির নাম 'টেন', মনোজকুমারের ছবি 'দশ নম্বরি' ।
(১৭) বারবারা বুশ ।
(১৮) মাইকেল হেসেলটিন ।

জর্জ ওয়াশিংটন
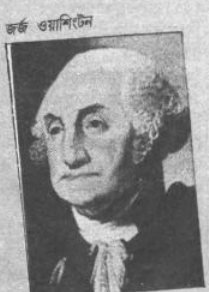
গ্রেগ চ্যাপেল

বারবারা বুশ

মহম্মদ সাঈদ

কুইজ

বিষয় : মুঘল সাম্রাজ্য

প্রশ্ন :

(১) কোন মুঘল সম্রাটের নামের অর্থ 'বাঘ' ?

(২) পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর নতুন এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করায় ইব্রাহিম লোদির সৈন্যদল হেরে গিয়েছিল। কী সেই অস্ত্র ?

(৩) পানিপথ ছাড়াও, ভারতের বুকে আরও দুটি যুদ্ধে বাবর বিজয়ী হয়েছিলেন। সেই দুটি যুদ্ধ কী কী ?

(৪) পুত্র হুমায়ুন অসুস্থ হলে বাবর কীভাবে তাঁকে সারিয়ে তুলেছিলেন ?

(৫) কোন মুঘল সম্রাটের আসল নাম নাসির-উদ-দিন-মহম্মদ ?

(৬) চৌসার যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর হুমায়ুন কীভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন ?

(৭) কীভাবে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছিল ?

(৮) তরুণ আকবরকে কোন মন্ত্রী রাজ্যশাসনের কাজে সাহায্য করতেন ?

(৯) কী উপলক্ষে আকবর ফতেপুর সিক্রি শহর নির্মাণ করেছিলেন ?

(১০) এক যুদ্ধবিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে আকবর ফতেপুর সিক্রিতে বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করেছিলেন। কী সেই যুদ্ধ ?

(১১) আকবরের প্রিয়তম সভাসদ আবুল ফজলকে ভাড়াটে এক খুনি খুন করেছিল। কে সেই খুনিকে ভাড়া করেছিলেন ?

(১২) মির্জা বেগ ইতিহাসে অন্য এক নামে বিখ্যাত। কী সেই নাম ?

(১৩) নুরজাহান আসল নাম কী ?

(১৪) 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গির' কী ?

(১৫) আর্জুমান বানু বেগম ইতিহাসে কী নামে বিখ্যাত ?

(১৬) জাহাঙ্গিরের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর কন্যা মমতাজ, সম্পর্কে সেই মন্ত্রী শাহজাহানের শ্বশুর। তাঁর নাম কী ?

(১৭) শাহজাহানের প্রিয়তম কন্যার নাম কী ?

(১৮) তাজমহলের মুখ্য স্থপতির নাম কী ?

(১৯) 'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে তা এইখানে। এইখানে।' —এই পঙ্‌ক্তিগুলি কোথায় লেখা আছে ?

(২০) 'সাম্রাজ্যের কোনও মধুরতা আর নেই। জীবনে আর কোনও অবলম্বনই আমার থাকল না।' কথাগুলি কে বলেছিলেন ? কখন বলেছিলেন ?

(২১) বাদশাহ আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসে কী উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ?

(২২) ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব একটিমাত্র শিল্পের চর্চায় উৎসাহ দিতেন। কী সেই শিল্প ?

(২৩) আওরঙ্গজেব তাঁর তিন ভাইকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসেছিলেন। সেই তিন ভাইয়ের নাম কী ?

(২৪) আওরঙ্গজেব কোন শিখ গুরুকে হত্যা করেছিলেন ?

(২৫) আওরঙ্গজেব কোথায় 'বিবি কা মকবারা' সমাধি স্থাপন করেছিলেন ?

(ক)

(খ)

(গ)

ছবির পরিচয় :

প্রশ্ন

(ক) শেষ জীবনে শাহজাহান এখানে বন্দিদশা কাটিয়েছেন। বিখ্যাত এই দুর্গের নাম কী ?

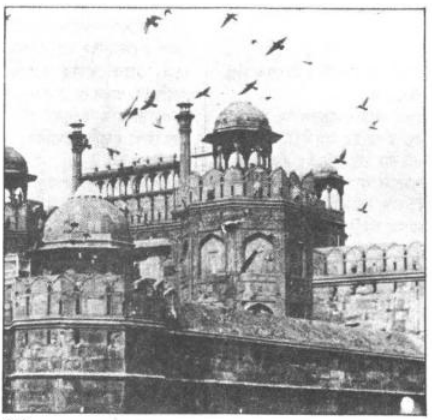

(খ) আওরঙ্গজেব এই মারাঠা সেনানায়কের নাম দিয়েছিলেন 'পার্বত্য মূষিক'। কে ইনি ?

(গ) শেষ মুঘল সম্রাট। সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহিরা এঁকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল। এঁর নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) লালকেল্লা। (খ) শিবাজি। (গ) বাহাদুর শাহ জাফর।

উত্তর : (১) বাবর। (২) কামান। (৩) খানুয়া ও ঘাঘরা। (৪) হুমায়ুনের বদলে বাবর ঈশ্বরকে নিজের জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অসুস্থ হুমায়ুনের বিছানার পাশে সাতবার ঘুরে বাবর এই প্রার্থনা করেছিলেন। হুমায়ুন সেরে ওঠেন, আস্তে-আস্তে বাবরের শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে। সেই ভাঙা শরীর আর ঠিক হয়নি, ১৫৩০ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাবর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। (৫) হুমায়ুন। (৬) নদীতে ভাসমান এক ভিস্তিতে চেপে হুমায়ুন পালিয়ে গিয়েছিলেন। (৭) তাঁর নিজস্ব পাঠাগারের পাথরের সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন হুমায়ুন। (৮) বৈরাম খান। (৯) পুত্রের জন্মের আনন্দোৎসব পালন করার জন্য। (১০) গুজরাতের যুদ্ধ। (১১) রাজপুত্র সেলিম। ইনিই পরবর্তীকালের সম্রাট জাহাঙ্গির। (১২) ইতমদ-উদ-দৌলা। ইনি নূরজাহানের পিতা। (১৩) মেহেরুন্নিসা। (১৪) জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী। (১৫) মমতাজ মহল, শাহজাহানের স্ত্রী। (১৬) আসফ খান। (১৭) জাহানারা। (১৮) ওস্তাদ ইশা। (১৯) লালকেল্লার 'দেওয়ান-ই-খাস' সভাঘরে। (২০) মমতাজের মৃত্যুর খবর পেয়ে শাহজাহান এই খেদোক্তি করেছিলেন। (২১) আলমগির। এই উপাধির অর্থ 'পৃথিবী-বিজেতা'। (২২) ক্যালিগ্রাফি বা হস্তলিপি। (২৩) দারা শিকো, শাহ সুজা, মুরাদ বক্স। (২৪) গুরু তেগ বাহাদুর। (২৫) আওরঙ্গাবাদ।

বইয়ের খবর

পশুপাখির কান্না

একদিন উইলি স্কুল থেকে ফিরে দেখল বাবা তার জন্য কিনে এনেছেন ছোট্ট ঝকঝকে একটা খেলনা রেলগাড়ি। সেই রেলগাড়িটা নিয়ে একা-একাই খেলতে লাগল ছেলেটি। রাত্রে খাবার পরে আবার সে রেলগাড়িটা নিয়ে খেলায় মেতে উঠল। রাত বেড়ে যেতে লাগল, উইলির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষে একচোট বকাঝকা করে উইলির মা তাকে শুতে পাঠালেন।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে উইলি স্বপ্ন দেখল, রাত্রিবেলা এক বিশাল প্রান্তর বেয়ে ছুটে চলেছে তার ট্রেন। সে সেই ট্রেনের ড্রাইভার। ছুটন্ত ট্রেনে কয়লা জোগান দিচ্ছে কে ? তার ছোট্ট কুকুরছানা। একটা কুয়াশাভরা মাঠে ট্রেন দাঁড় করিয়ে উইলি কুকুরছানাটাকে নিয়ে নামল ছুটোছুটি করতে। দু'জনে মিলে দৌড়োদৌড়ি করছে, হঠাৎ একটা বাচ্চা হাতি এসে বলল, "দয়া করে আমাকে তোমার ট্রেনে তুলে নেবে ? পেছনে কয়েকটা লোক আমাকে তাড়া করে আসছে আমায় মেরে ফেলে আমার দাঁত দুটো খুলে নেবে।" তাকে তুলে উইলি জোরে চালিয়ে দিল ট্রেন। হঠাৎ সামনে দ্যাখে, একটা সিল মাছ খুব কাঁদছে আর হাত নাড়ছে। গাড়ি আবার থামাল উইলি। সিল মাছেরও এক কথা। মানুষ তাকে মারতে আসছে। তাকে মেরে ফেললে ওই প্রজাতির সিল মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। তাকেও অগত্যা ট্রেনে তোলা হল। এইভাবে পথে একে-একে দেখা হল একটা সারসপাখি, একটা বাঘ আর টেডি ভালুকের সঙ্গে। সবাইকে ট্রেনে তুলে পালাচ্ছে উইলি, হঠাৎ ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকে, "উঠে পড়ো, ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে, সকাল থেকে আজ কী যে হয়েছে, বারান্দায় দেখি একটা হাতি বসে আছে, বাথটবে একটা সিলমাছ, চৌবাচ্চার পাশে একটা সারস আর কী ভয়ঙ্কর, সিঁড়ির পাশে ঘুমোচ্ছে ডোরাকাটা বাঘ !"

অনবদ্য এই বইটির নাম 'হে ! গেট অব আওয়ার ট্রেন'। লেখক জন বারনিংহাম। ক্রাউন প্রকাশন সংস্থা থেকে বইটি বেরিয়েছে। দাম : ১৩·৯৫ ডলার।

ভাইয়ের জন্য

মিকা যখন তার কাকা-কাকিমার বাড়িতে বেড়াতে এল তখন সে জানত না তার জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে। তার কাকা-কাকিমা থাকেন বড় রাস্তার ধারে গাছপালাভরা এক মাঠের মধ্যে ছোট্ট আর খুব সুন্দর একটি কাঠের বাড়িতে। মিকা তার কাকিমা রোস আর কাকা রবসনের সঙ্গে এক সপ্তাহ খুব মজা করে কাটাল। তারপর হঠাৎ কাকিমার একটি ফুটফুটে ছেলে হল। মিকা তার ভাইকে এত ভালবেসে ফেলল

ডেভিড তামুরার আঁকা 'মিকাস বেবি'র ইলাস্ট্রেশন

কিছুদিনের মধ্যেই যে, কাকার বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরতে তার একটুও ইচ্ছে করে না ! কিন্তু ওদিকে মিকার বাবা-মা মিকাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। মিকা আর তার ছোট্ট ভাইয়ের কাহিনী সরস ভাষায় প্রকাশ করেছেন রিন্ডা এম্ বায়ার্স তাঁর নতুন বই 'মিকাস বেবি'-তে। প্রকাশক আর্চার্ড সংস্থা। দাম : ১৩·৯৫ ডলার। ছবি এঁকেছেন ডেভিড তামুরা।

ছড়া এবং গল্প

দীপ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া
প্রমা প্রকাশনী
৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ
কলকাতা-১৭
দাম : ১০ টাকা

"এমন যদি থাকত খাবার/ ডিকশনারির বড়া/ গল্পের চপ থাকত তবে/ পায়েস হত ছড়া।" কিংবা "শহর ছেড়ে গ্রামে পাড়ি/ কু-ঝিকঝিক রেলের গাড়ি।/ হাতছানিটা ওদের/ হলুদ বনের কলুদ ফুলের/ আর যে মিঠুন রোদের।" এমনতরো আটচল্লিশটি মজাদার কথা সাজিয়ে দীপ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া। কিছু-কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়াও আছে এ বইটিতে। দীপ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ার হাতটি মিষ্টি যা কিশোরদের পড়তে ভাল লাগবে।

অবাক অভিযান
সুকুমার ভট্টাচার্য
দীপায়ন,
২০, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৯
দাম : ২০ টাকা

আজকাল দেশ-বিদেশের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে বাংলায় কিশোর উপন্যাস লেখা হচ্ছে। সুকুমার ভট্টাচার্যের 'অবাক অভিযান' তেমনই এক আশ্চর্য কিশোর উপন্যাস। যা রোয়াল ঢালের 'জেমস অ্যান্ড দ্য জায়েন্ট পিচ' অবলম্বনে রচিত। ঝরঝরে ভাষায় লেখা উপন্যাসটি ঘটনার ঘনঘটায় ঠাসা। বাপান সই কৈচো বিছে মাকড়সা ফড়িং জোনাকি ইত্যাদির সঙ্গে আকাশ বেড়ানো, তাদের মুখে ছড়া কিশোরদের ভাল লাগবে।

গৌতম হাজরা

হোটেলে ভূত

বার্নি আর তার বাবা-মা গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রতীরে এক ছোট্ট ছিমছাম হোটেলে উঠেছে তারা। কিন্তু আসার পরদিন রাত্রেই তারা বুঝতে পারল হোটেলের ওই ঘরে এক অশরীরী প্রেতাত্মা বসবাস করে।

ছুটির সময়, অন্য কোনও হোটেলেই জায়গা পাওয়া যাবে না। ফলে, ওই ভূতুড়ে ঘরেই বার্নিদের বাকি দিনগুলো কাটাতে হবে। রাত্রি হল ফের। আবার শুরু হল ভূতুড়ে কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত জানা গেল ভূতটির বয়স বার্নির সমান। মাত্র এগারো বছর। সমবয়সী একটি মানুষ-কিশোর আর ভূত-কিশোর, তাদের মধ্যে কি বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব ? সেই নিয়েই এই কাহিনী। বইটির লেখক ফিলিস রেনল্ডস নেলর, নাম—'বার্নি অ্যান্ড দ্য বেসেলডর্ফ গোস্ট'। অ্যাথিনিয়াম প্রকাশন সংস্থা থেকে বইটি প্রকাশিত। দাম : ১২·৯৫ ডলার।

অভীক মজুমদার

নানারকম

ধাঁধা

এবার ভাইফোঁটার দিন ছোটকা আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে দিল। অথচ পরে যখন উত্তরটা শুনলাম, তক্ষুনি মনে পড়ে গেল, আরে, এ-ব্যাপারটা তো আগে শুনেছি। অথচ ঠিক সময়ে বেমালুম ভুলে গেলাম। শুধু আমি বলে কেন, কারওই মনে পড়েনি। তাই, তোমাদের কাছে প্রশ্নটা করতে চাইছি।

ভাইফোঁটার দিন সন্ধেবেলা মুখে-মুখে ধাঁধা আর হেঁয়ালিচর্চা হচ্ছিল। হঠাৎই ছোটকা এই ধাঁধাটা শোনাল। বলল, ঠিক এই ধাঁধাটাই যে আগে বলেছি তা হয়তো নয়, কিন্তু সত্যিমিথ্যের ধাঁধার সমাধানের মূল যুক্তি যারা জানে, তারা চট করে উত্তর করতে পারবে। ধাঁধাটা এইরকম—

প্রথম ধাঁধা ॥ এক দ্বীপে দু' ধরনের মানুষ থাকে। একদল গুহাবাসী, অন্যদল বৃক্ষবাসী। গুহাবাসীরা সব সময় মিথ্যে কথা বলে, বৃক্ষবাসীরা আবার উলটো। তারা সব সময় বলে সত্যি কথা। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, বাইরের কোনও

তোমরা যারা আগে শুনেছ কখনও, দ্যাখো, মনে করতে পারো কি না। যারা এসব ধাঁধার কথা শোনোনি কখনও, তারা নতুন করে চেষ্টা করো।

মানুষ এ-দ্বীপে গেলে চোখে দেখে কিছুতেই বুঝতে পারবে না, কে গুহাবাসী আর কে বৃক্ষবাসী। চেহারা, পোশাকআশাক, হাঁটাচলা— একেবারে একরকম।

তো, এক ভদ্রলোক সেই দ্বীপে ঘুরে আসার গল্প শোনাচ্ছিলেন তাঁর বন্ধুদের। তিনি বলছিলেন, "আমার কোনও অসুবিধে হয়নি ওই দ্বীপে পৌঁছে। দ্বীপে নেমে প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হল, তাকে প্রশ্ন করলাম, 'ভাই, তুমি গুহাবাসী না বৃক্ষবাসী?' উত্তরে লোকটি বলল, 'আমি গুহাবাসী'। ব্যস, সেই লোকটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার সঙ্গেই ঘুরে-ঘুরে দ্বীপটা দেখলাম।"

এ-গল্প যাঁরা শুনছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন দারুণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি কিন্তু গল্প শুনে ধরতে পারলেন, ভদ্রলোক বানানো গল্প ফেঁদে বসেছেন। ওঁর কথা সত্যি হতে পারে না। কেন এমন মনে হল বুদ্ধিমান শ্রোতাটির, বলতে পারো?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বসু-পদবি জুড়ে দিলে কোন নামের মানে দাঁড়াবে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
লালতকলি

গতবারের উত্তর ॥ (১) মনে হতে পারে, ছোট ইটের ওজন ১ কিলোগ্রাম। কিন্তু তা কেন হবে? ছোট ইটটা তো বড় ইটের থেকে শুধু দৈর্ঘ্যেই চার ভাগ কম নয়, প্রস্থে এবং উচ্চতাতেও চার ভাগ করে কম। তাই সঠিক উত্তর ৪,০০০ গ্রাম ÷ (৪×৪×৪) = ৬২·৫ গ্রাম। (২) $১^{১^{১}}$ (৩) বৃক, যার অর্থ নেকড়ে। অন্যগুলি সিংহের প্রতিশব্দ।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটার জন্য কোনও উপকরণ জোগাড় করতে হবে না। শুধু চাই কাগজ আর পেনসিল। আর চাই মজা করার জন্য অন্তত একজন বন্ধু। তো, এ-উপকরণ আর কার নেই? সুতরাং এসো, খেলাটা চটপট শিখে ফেলি।

নীচের ছবির মতো কয়েকটা বিন্দুচিহ্ন ও কয়েকটা তারা এঁকে ফেলো সাদা কাগজের ওপর—

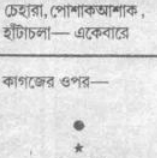

এবার বন্ধুদের বলো, কয়েকটা বিন্দুচিহ্ন ও তিনটে তারা হয়েছে কাগজটার ওপর। বিন্দুগুলোকে ছুঁয়ে আটটা সরলরেখা এমনভাবে টানতে হবে, যাতে কিনা তিনটে তারা ঢুকে যায় তিনটে বর্গক্ষেত্রের মধ্যে। পারবে?

পারা খুব সহজ যে নয়, সেটা দেখতে পাবে বন্ধুদের নানারকম লাইনটানার মধ্যে। উত্তরের ছবিটি আগে থেকে যদি মাথার মধ্যে গাঁথা না থাকে, অথবা হঠাৎ যদি মগজে ঝিলিক দিয়ে না ওঠে তখন যতভাবেই রেখা টেনে যাক-না কেন তারা, সঠিক উত্তর খুঁজে পাবে না। আর তাই দেখবে, শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নিচ্ছে বন্ধুরা। তোমাকেই বলছে, উত্তরটা করে দেখাও দেখি।

তুমি তখন চটপট আটটা রেখা টেনে তিনটে বর্গক্ষেত্র তৈরি করে ফেলো। দেখবে তিনটে তারা কেমন চৌকো তিনটে ঘরে বন্দী। ঠিক এইরকম—

মজারু

কত কথায়

প্রথমে তিনটি শব্দ তৈরির সূত্র দেওয়া যাক। এই সূত্র ধরে শব্দ তিনটি বার করে ফেলো দেখি? (ক) বানরযন্ত্র। (খ) সূর্যফসল। (গ) কলসকান।

২। এবার এমন তিনটে শব্দ দিচ্ছি যার অক্ষর উলটে-পালটে অন্য তিনটি শব্দ তৈরি করা যায়; (ক) কাকলি। (খ) খনক। (গ) জহরত।

৩। এই প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিতে হবে খুব চটপট। বেশি ভেবে উত্তর দিতে গেলে কিন্তু গুলিয়ে যেতে পারে, কারণ প্রশ্নগুলো আসলে কথার মারপ্যাঁচ। (ক) কোন্ ষণ্ডর শিং নেই? (খ) কোন্ পাল প্রাচীন অস্ত্র? (গ) কোন্ টিকি শব্দ করে?

কথক

ছবি : দেবাশিস দেব

গুণে দ্বিগুণ

এবার এল ত্বকের সমস্যাকে দু'ভাবে জয় করার দ্বিগুণ ক্ষমতা

কেয়ো-কার্পিন

আয়ুর্বেদিক অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

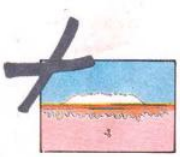

চটচটে অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম ত্বকের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না।

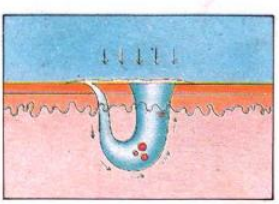

কেয়ো-কার্পিন চটচটে নয়। তাই সহজেই ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে এবং ভিতর থেকে ব্রণ, কাটা-ছড়া, শীতে ফাটা ত্বক ও ন্যাপিয়্যাশ সারায়। উপর থেকে ত্বকের সুরক্ষা তো করেই।

TSA-C/DMKKAC/383/BN

উপর থেকে রক্ষা করে ভিতর থেকে সারায়

Dey's®

দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

ANANDAMELA 31 OCTOBER 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

এসে গেল

একেবারে নতুন

'ফ্রুট স্যালাড আহার'

ফ্যারেক্স-ফ্রুট্স-এ রয়েছে গমদানার ও দুধের পুষ্টির
সঙ্গে আগেই-পাক করা রসালো স্বাদের আপেল,
আম আর কলার অপূর্ব সমন্বয়।

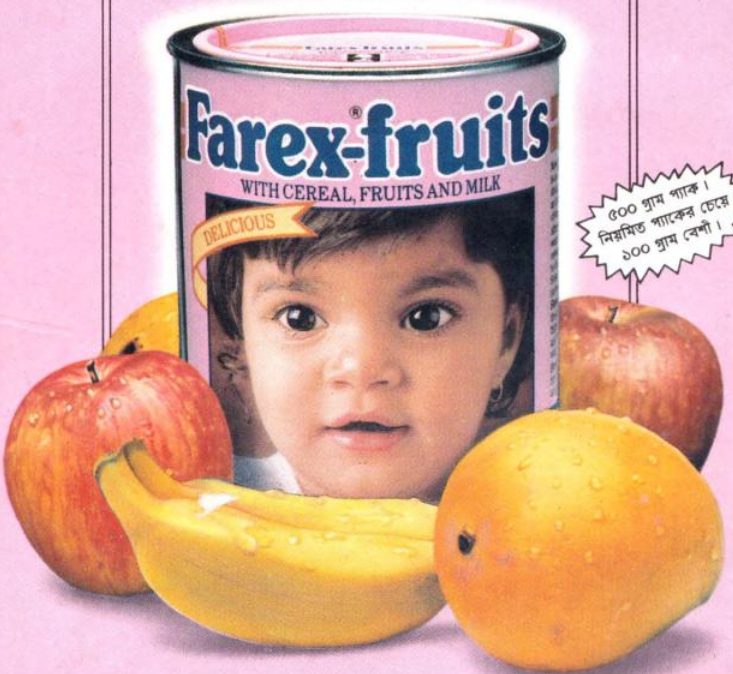

ফ্যারেক্স-ফ্রুট্স
বেড়ে ওঠার স্বাদভরা উপায়।

সবই দোকানে
একই সাশ্রয়কর দামে পাবেন।

বর্তমানে নির্ধারিত বাজারগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে।

Gx/247.90 Bn R